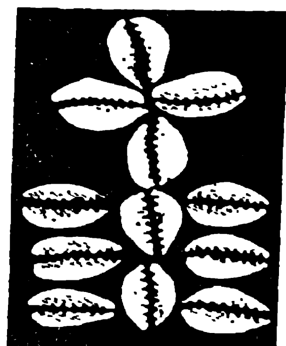


সন্তোষকুমার ঘোষ

কড়ির ঝাঁপি

ক্যালকাটা বুক ক্লাব
প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৬৩

প্রকাশক
জ্যোতিপ্রসাদ বসু
ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড
৮৯ হ্যারিসন রোড কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর
যোগেশচন্দ্র সরখেল
ক্যালকাটা ওরিয়েণ্টাল প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

অঙ্গসজ্জা
মণীন্দ্র মিত্র

ব্লক
ব্লকম্যান (প্রোসেস)

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
দি নিউ প্রাইমা প্রেস

বাঁধাই
এশিয়াটিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

দাম তিন টাকা

সুশীল চট্টোপাধ্যায়কে

আকৈশোর সখ্যের সাক্ষ্য

এই লেখকের

কিনু গোয়ালার গলি
নানা রঙের দিন
পারাবত
শুকসারী
চীনেমাটি
মোমের পুতুল

হো টেলের খাতায় যখন ঠিক-ঠিক পরিচয় লিখিয়েছিলুম, তখন পরিণাম ভাবিনি। ঘর দেখে মন খুশী, কর্মচারীটি যেই জিজ্ঞাসা করলে পেশা কী, বলে দিলুম ডাক্তারি। প্রায় হাতে হাতে ফল পেতে হল।

ভারতবর্ষের তীর্থ; অর্থাৎ পাণ্ডা, বেশ্যা, ষাঁড, কুকুর আর ভিখারীর ছড়াছড়ি। এদের হাত এড়িয়ে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সারলুম, এবং অস্বীকার করব না, স্নানার্থিনীও দেখলুম। দুপুরে হৃষিকেশ, লছমনঝোলা দেখে চিত্ত হৃষ্ট হল, কিন্তু মুষড়ে পড়ল শরীর। পেশী আর গাঁটে-গাঁটে ব্যথা। স্থির করলুম বিকেলে আর নড়ব না, শুয়ে-শুয়েই তীর্থ-মাহাত্ম্য ধ্যান করব, ঘুমিয়ে পড়ব। দ্বিতীয় ইচ্ছাটা অবশ্য পূর্ণ হয়নি, কেননা হোটেলের খাট ছারপোকা-ছাওয়া, ক্ষণে-ক্ষণে শরশয্যার স্বাদ পেয়ে চমকে উঠলুম।

প্রথম

একটু পরেই দরজায় টোকা পড়ল। ভাবলুম হোটেলের চাকর, চায়ের বাসন সরাতে এসেছে। বললুম, আ যাও।

কবাট ঠেলে যে এল তাকে দেখেই নিজের ভুল টের পেলুম। পায়ে নাগরা, নাসিকার সানুদেশে চুমড়ানো শৌখিন গোঁফ। যেমন শিকারী বেরালের, তেমনি রইস লোকের,—ওই এক নির্ভুল চিহ্ন। উঠে পড়ে নকল সৌজন্য দেখিয়ে বললুম বসুন।

লোকটি ব্যস্ত, কিছু-বা বিব্রত, বসল না; বিশুদ্ধ হিন্দিতে বললে, আপনি ডাক্তার? আমি পাশের ঘরে উঠেছি। আমার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, একবার আসবেন?

জানা ছিল ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। ডাক্তারকে যে তীর্থস্থানে এসেও নাড়ি টিপে খেতে হয়, সেটা এবার টের পেলুম। লোকটি বোধ হয় বুঝেছিল আমি ইতস্তত করছি। ইয়া দশাসই চেহারা, কিন্তু বিনয়ে যেন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। বললে, ডক্টর-সাব, আমরাও এখানে বিদেশি, বনারস থেকে এসেছি, যাব কেদার-বদরি। এখানকার কাউকেও চিনিনে। স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, হোটেলওয়ালাকে বললুম একজন ডাক্তারকে খবর দিতে। সে আপনার খোঁজ দিলে। আপনি চলুন ডক্টর-সাব, আপনার ফীজ আমি দেব।

অগত্যা উঠতেই হল। গলায় জামা এবং জুতোয় পা গলাতে গলাতে বললুম, ফী নেব না, তীর্থে এসে না-হয় কিছু পুণ্যই করা গেল। আসুন, আগে আপনার স্ত্রীকে দেখে তো আসি।

ভদ্রলোক প্রায় প্রৌঢ়, তাকে দেখেই আন্দাজে রোগিণীর একটা চেহারা ধরে নিয়েছিলুম। উল্কি আর নথ, বিপুল বক্রনেত্র মধ্যবয়সী একটা চর্বি আর মাংসের স্তূপ ; বিবৃতোদরা, স্তম্ভোরু। কিন্তু যা দেখলুম তাতে চৌকাঠে এক পলক দাঁড়িয়ে থাকতে হল। দেখলুম যৌবনশেষ ক্ষীণ একটি রমণী বিছানার চাদরের সঙ্গে মিশে ক্রমাগত এ-পাশ ও-পাশ ফিরে ছটফট করছে। ওজনে একটি রাজহংসীর চেয়ে বিশেষ বেশি হবে না, মেদ-মাংসের প্রাচুর্য দূরে থাক, যে-উরজস্ফীতি স্ত্রীলোকের দেহলক্ষণের অন্তর্গত, সে দুটিও এখন ফলহীন বৃন্তবৎ, লুপ্তপ্রায়।

কিন্তু রোগিণীর রূপধ্যানে ডাক্তারি এথিক্স অশুদ্ধ হয়, সুতরাং চিন্তাটাকে বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দিলুম না। কাছে গিয়ে বললুম, কী কষ্ট আপনার।

বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, বড় জ্বালা।

মুখের একাংশ ঢাকা, বুলিও হিন্দী, তবু চমকে উঠলুম। মনে হল, এ-গলা ইতিপূর্বে কোথাও শুনেছি। শ্রুতি স্মৃতিকে উত্তেজিত করে তুলল। কিন্তু তখনকার মতো কৌতূহল দমন করতে হল।

পরীক্ষা এবং প্রশ্নাদির পর বুঝলুম পুরোনো অম্বলের ব্যথা, অনিয়মে পথকষ্টে, অনিদ্রায় বেড়েছে। যতবার ভদ্রমহিলা আমার কথার জবাব দিলেন, ততবার চমকে উঠলুম। মনে হল পরিচিত কারও কথা শুনছি, নতুবা এই ভদ্রমহিলাই আর কারও বাচনভঙ্গি নকল করছেন।

তাড়াতাড়ি একটা প্রেসক্রুপ্সন লিখে ওর স্বামীর হাতে দিলুম। বললুম, ওষুধটা এখুনি আনিয়ে নেবেন। পথ্যসম্পর্কিত একটা নির্দেশ দিয়েছিলুম মনে আছে।

লোকটিকে কিছু বিব্রত হতে দেখলুম। ওষুধের দোকান হয়ত অনেক দূর, সে-সময়টা রোগিণী একলা থাকবে। আশ্বাস দিলুম, ভয় নেই। হোটেলের কোন চাকর পাঠাতে পারেন কিনা দেখুন। তা-ছাড়া আমি তো পাশেই আছি। নজরে রাখব।

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লোকটি বেরিয়ে গেল, আমিও সঙ্গে বেরিয়ে বারান্দায় এলুম। পিছনের দরজা খোলাই রইল।

নদীর পার-বরাবর বারান্দা অস্থির পায়ে চষতে শুরু করলুম। নিস্তেজ, আলোমলিন ঘর থেকে থেমে থেমে ক্ষীণ একটা গোঙানি। যদিও আমি ডাক্তার, মেয়েদের কাছে শুকদেবের মত, তবু অস্বস্তি একেবারে ছিল না বলতে পারিনে। হরকিপৈড়িতে গঙ্গা পূজার অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি, ক্লক-টাওয়ারের উদ্ভাসিত ঘড়িটার পিছনে কোন একটা শুক্লা-তিথির ভাঙা-ভীরু চাঁদ একেবারে নিষ্প্রভ। দূরের পাহাড়টা থেকে থেকে বুকে মুখে হালকা মেঘের ওড়না টানে, কখনও সরায়। পাতার নৌকোয় স্রোতের দীপের সারি। নিচের রাস্তায় সস্তার রিকশাওয়ালা মাঝে মাঝে হেঁকে যাচ্ছে—কনখল, কনখল। আর আমি দীর্ঘ আধ-অন্ধকার বারান্দায় স্তম্ভিত, কখনো-শোনা কণ্ঠস্বরকে সনাক্ত করতে চেষ্টা করছি।

সেই গোঙানির শব্দটুকু নিশ্চয়ই বিচিত্র এই পরিবেশের সঙ্গে বনে গিয়েছিল, নইলে থেমে যেতেই টের পেলুম কি করে। উঁকি দিয়ে দেখি মেয়েটি পাশ ফিরে জলের গ্লাসটা ধরতে চাইছে, পারল না, ফস্‌কে যাওয়া কাঁসার পাত্রটা ঝনঝান করে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল, জলে বালিশের একধার ভিজে উঠল।

তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে বললুম, থাক আপনি উঠবেন না, আমি জল এনে দিচ্ছি। কল থেকে জল ভরে গ্লাসটা ওর হাতে দিলুম। ঠিক তখনই চণ্ডীপাহাড় থেকে দমকা একটা হাওয়ায় ওর মুখের কাপড় না সরলে আমার স্মৃতির শবচ্ছদের মত পুরু আবরণটুকুও সরতো কিনা সন্দেহ।

চমকে উঠলুম। চিনলুম। বুলন্দশহরের দময়ন্তী গুপ্তকে চিনতে এত দেরি হল, এইটেই আশ্চর্য!

চিনলুম বটে কিন্তু দ্বন্দ্ব গেল না। প্রেসক্রুপ্‌সনে লিখেছিলুম ওমপ্রকাশ ভার্গব। টিকটিকির লেজের মত দয়মন্তী পুরণো পদবীটা না-হয় খসিয়েছেন বুঝলুম, কিন্তু নতুনটা জুড়লেন কী করে।

বিচক্ষণ পাঠক অবশ্য টের পেয়েছেন ঠিক যায়গায় কথারম্ভ করতে পারিনি। আগের কথা আগে না-সারার ওই বিপদ। প্রণয়ের যা রীতি, গল্পেরও তাই অর্থাৎ প্রথমে পায়ে ধরে সাধতে হয়। আমরা এ-নিয়ম মানিনে, হঠাৎ কোমর জড়িয়ে ধরি, তাতে ঈপ্সিতা ধরাতো দেয়ই না, ছটফট করে, ছাড়া পেলেই ছিটকে পালায়। রস থাক, একটা যন্ত্রযুগীয় উপমা দিই। ভারি গাড়িকে খানিকটা পিছু হটে তবে সামনে চলতে হয়। আমাকেও অগত্যা তাই করতে হবে, দু'চার কথায় আদিপর্ব সেরে ফিরতে হবে উত্তর খণ্ডে।

ডাক্তারি পাশ করে প্রথম দোকান খুলেছিলুম বুলন্দশহরে। মাঝারি শহর, প্র্যাক্‌টিস জমল না। সকালে বিকেলে তালা খুলে ঘরে ধুনো দেওয়াই সার। আমার আগে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই রোগী ক'টিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বখ্‌রা করে নিয়েছেন, দেবতারা যেমন সব অমৃত লুঠ করেছিলেন। পরবর্তীদের জন্য বিশেষ বাকি রাখেননি। আর, এ-কথা তো সবাই জানে সাধারণ লোকে ভরসা করে প্রাণ সঁপতে পারে মোটে দু'জনকে। অচেনা যমকে আর চেনা ডাক্তারকে।

তা-ছাড়া পয়সা-দেনেওয়ালা রোগীর সংখ্যাও বেশি ছিল না। শহরের বার আনা লোকই ছিল খয়রাতী আম-দবাখানার পেট্রন, বোতলে-পোরা লাল নীল জলের খদ্দের।

একটা লোককে, তার নাম যতদূর মনে পড়ছে বিষণলাল, কম্পাউণ্ডার রেখেছিলুম। লোকটা কাজ জানত না, সে প্রয়োজনও ছিল না, আমি যতক্ষণ বসে ওষুধের ক্যাটালগ নাড়াচাড়া করতুম, সে বকবক করত। এক মিক্‌শ্চার তৈয়ারীর কৌশল ছাড়া আর সব বিদ্যা ও জ্ঞান তার নখাগ্রে। শহরের পনের আনা এগার পাই লোকের সে নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখত। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এই জীবন্ত হূজ-হূ-বিশেষ লোকটির বকবক শুনে আমিও বহুলোকের পরিচয় জেনেছিলুম।

আমার দবাখানা ছিল সদর কাছারীর কাছে, দময়ন্তীদের কোয়ার্টারের রাস্তার ঠিক ও-পারেই। ওঁর স্বামী লালচাঁদ গুপ্ত শুনেছিলুম সবচেয়ে শাঁসাল

ক্রিমিনল উকিল। ক্রিমিনল কেসের উকিল, নিজে ক্রিমিনল নন, এ-টীকাটুকুর আশা করি প্রয়োজন নেই।

ডাক্তারকুলে যেমন সহস্রমারী, উকিলকুলে ইনি ছিলেন মক্কেলমারী, অর্থাৎ মোটা হাতে মক্কেলদের পকেট মারতেন।

দময়ন্তী শুনেছিলুম ইংরাজী লেখাপড়া শিখেছিলেন। কলেজের বুড়ি ছুঁয়েছিলেন কিনা জানিনে, তবে ওঁকে বারান্দায় ডেকচেয়ারে বসে ইংরিজী খবরের কাগজ পড়তে দেখেছি। ছোট মফঃস্বল শহরে সেকালে সেটাও তাকিয়ে দেখার বস্তু। দময়ন্তী সর্বদা পায়ে চটি পরতেন, পুরো নথ এবং ঘোমটার সাড়ে তিন পোয়া বর্জন করেছিলেন। স্বামীর বন্ধুদের সুমুখে বেরুতেন, তাদের সঙ্গে হেসে কথা কইতেন। তখনকার দিনে এমন সপ্রতিভভাব একমাত্র বাঙালী মেয়েদের মধ্যে দেখা যেত।

বয়সে, বলনে, দেহের গড়নে, চলবার ধরনে দময়ন্তীর মধ্যে একটা সৌষ্ঠব ছিল। দর্জির মত ইঞ্চি-গিরের মাপ নিয়ে তিনি রূপবতী ছিলেন কিনা কখনও হিসাব করিনি।

একদিন দময়ন্তী আমার ডিসপেনসারিতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। নতুন কেস পেলুম ভেবে খুশি হব-হব করছি, হঠাৎ দময়ন্তী একটা চাঁদার খাতা খুলে ধরলেন। মেয়েদের একটা সূচীশিল্প প্রদর্শনী করছেন, কিছু দিতে হবে।

লিখলুম পাঁচ টাকা। ধন্যবাদ জানিয়ে দময়ন্তী উঠে গেলেন, দেখি টুলে বসে বিষণলাল মুখ টিপে হাসছে।

ধমক দিলুম, হাসছ যে।

বললে, পাঁচ টাকা দিলেন, তাই।

বেশি প্রশ্ন করে কেঁচো খুঁড়তে ভরসা পেলুম না। বিষণের হাসির মানেটা বুঝেছিলুম। সুন্দর মুখ দেখে পাঁচ টাকা দিয়েছি, অন্য কেউ এলে পাঁচ আনাও পেত না।

বিষণলাল আপন মনেই খানিক পরে বললে, এতেই পার পেলেন ভাববেন না। ও আরও অনেকবার আসবে।

অনেকবার আসবে, কেন?

বিড়বিড় করে বিষণলাল যা বললে তার মর্মার্থ এই, বাঁজা মেয়েমানুষ, দময়ন্তীর কি শখের শেষ আছে। নানান হুজুগ নিয়ে বার মাস মেতে আছে। কুকুর পোষে, পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক বিলোয়।

হুঁশিয়ারিটা ফলেছিল। দময়ন্তী এর পরে মাঝে মাঝেই এলেন। মফঃস্বল শহর, আর্ট একজিবিশন নেই, নাচ গানের জলসারও তখন পর্যন্ত চলন হয়নি, তবু হৈ-চৈ-এর এক একটা ছুতো তিনি ভেবে বার করতেন ঠিক। প্রতিবারই দু'পাঁচ টাকা দিয়ে তবে রেহাই পেতুম।

বাপ-মা-মরা ছেলেমেয়েদের জন্যে দময়ন্তী একটা অনাথাশ্রম খোলার উদ্যোগ করছিলেন, আমরাও উৎসাহ দিয়েছিলুম। সরকারী গ্রাণ্ট এবং মিউনিসিপ্যাল আনুকূল্যের জন্যে চিঠি লেখালেখি চলছিল।

শুধু চাঁদায় চলে না। স্বয়ং লালচাঁদবাবু নাকি হাজার দশেক টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন।

হঠাৎ একদিন শুনলুম অনাথাশ্রম খোলা হবে না। খরচের ভয়ে লালচাঁদবাবু পিছিয়ে গেলেন না কি।

বিষণলালের মুখে শুনলুম তা নয়। লালচাঁদবাবুর প্রচুর আয়, এ-সব ছোটখাটো খরচকে তিনি পরোয়া করেন না। সন্তানাদি নেই, সম্পত্তি ভোগ করবে কে। তিনি নিজে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ফূর্তিতে মজে আছেন, স্ত্রীকেও লম্বা সুতোয় স্বাধীনতা দিয়েছেন। যা-খুশি করুক। লালচাঁদবাবুকে যেন চেক সইয়ের বেশি হাঙ্গামা পোয়াতে না হয়।

শুনলুম, বাগরা দিয়েছে রতনলাল। লালচাঁদবাবুর দূরসম্পর্কের ভাগনে, সন্তানাদি না হলে সে-ই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তাকেও আমি দেখেছি, উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের ঝাঁকরা চুলওয়ালা ছোকরা, ঘুড়ি আর পায়রা ওড়ান ছাড়া কোন বিদ্যা রপ্ত করেনি। অনাথাশ্রম হলে তার ভাগের টাকায় কম পড়ে। সে-ই বলেছে, 'মামী, এসব খেয়াল ছাড়। বাজে কাজে এ-ভাবে হাজার হাজার টাকা তুমি ওড়াতে পারবে না।'

কিন্তু শুধু তার কথাতে নয়। আরও একটা কারণ ছিল। সেটা আর ক'দিন পরে টের পেলুম। লালচাঁদবাবু কোর্ট থেকে ফিরে ক্লাবে গেছেন। ও-বাড়ির বুড়ি ঝি আমাকে ডাকতে এল।

ডাক্তার হিসাবে লালচাঁদবাবুর বাড়িতে সেই আমার প্রথম পদার্পণ! বুক পরীক্ষার নল, জ্বরকাঠি ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গেই নিয়েছিলুম, চামড়ার ঝাঁপিটাও ভুলিনি। অনেক অভিজ্ঞতার ফলে দেখেছি ওটা হাতে শক্ত করে ধরা থাকলে মনে কেমন জোর পাই, বুক ধুকধুকটাও অনেক কমে যায়।

জিজ্ঞাসা করলুম, কার অসুখ। শুনলুম স্বয়ং বিবিজীর।

বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল না। চোখের পাতা টেনে এবং দু'চারটে প্রশ্ন করেই যা টের পাবার, পেলুম, তবু নিঃসন্দেহ হতে বললুম, আপনি ঠিক জানেন, এর আগে আপনার কখনও এমন অনিয়ম হয়নি ?

সলজ্জ ঘাড় কাত করে দময়ন্তী জানালেন, না।

বললুম, তবে তো আমি যা ভেবেছি, তাই। আমি একটা দু'টো ওষুধ লিখে দিচ্ছি। মনে ফূর্তি আর সাহস রাখুন। দু'একমাস পরে বরং দিল্লী বা লখনৌ গিয়ে একজন লেডী ডাক্তার দেখিয়ে আসবেন।

বুড়ি-ঝি ফের আমাকে সদর অবধি পৌঁছে দিল। বাইরের ঘরে রতনলাল বসেছিল, কেমন একটা অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টি, মনে হল আমাকে কিছু বলবে। কিন্তু সুযোগ পায়নি, আমি তার আগেই রাস্তায় নেমে পড়েছিলুম। ডিসপেনসারীতে পৌঁছে চেয়ারে আসীন হবার আগে স্বস্তি পাইনি, মনে হয়েছিল পিঠে তীর বিঁধে আছে। রতনলাল ওর জলন্ত চোখ দু'টো দিয়ে আমাকে অনুসরণ করছিল, তাতে ভুল নেই।

বিষণলালকে সব কথা বলতে সে শুধু হাসলে।—ডক্টরসাব, এতো হবেই। ওর হাত থেকে এতবড় সম্পত্তিটা ফসকে যাবে, ও চটবে না ?

বললুম, সবটা ফসকাবে না। লালচাঁদবাবু ওকে কিছু দেবেন নিশ্চয়ই। বিষণলাল গম্ভীর গলায় বললে, কিছুতে পুরোটার আশ মেটে না, ডক্টরসাব।

রতনলাল সেদিনই এসেছিল। তখন অনেক রাত। বিষণলালকে বিদায় দিয়ে দরজায় কুলুপ দেবার উদ্যোগ করছি।

রতনলাল এল। চেয়ারে ধপ করে বসে বলল, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল ডক্টর।

ওর প্রস্তাব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। গলা ধাক্কা দিতে হলে ওকে ছুঁতে হয়। সে-প্রবৃত্তি হল না। বললুম, আপনি ভুল ঠিকানায় এসেছেন। এ-সব নোংরা কাজ আমি করি না।

এতক্ষণ ওর চোখ জ্বলছিল ; এবার লোকটা নির্লজ্জের মত হাসতে শুরু করল। বলল, কত টাকা চান আপনি। হাজার, দু'হাজার ?

বললুম, লাখেও নয়।

হাসতে হাসতেই রতনলাল বললে, লাখ টাকা আপনি কখনও এক সঙ্গে দেখেননি। সে আন্দাজই আপনার নেই। বেকুব না হলে

দু'হাজারেই রাজি হতেন! কড়া গোছের দু'ডোজ ওষুধ মিশিয়ে দিতেন, কেউ জানতেও পেত না। জানেন, দেহাতি একটা দাই মাত্র শও রুপেয়া পেলেই এ-কাজে রাজি হবে ?

দাঁতে দাঁত চেপে বললুম, রতনলাল তোমাকে আমি পুলিশে দেব।

রতনলালের ব্যবহারে চটেছিলুম, বিস্মিত হইনি। বিস্মিত করলেন লালচাঁদবাবু স্বয়ং। সেটা পরদিনের ঘটনা।

সেদিনও বিষণলাল চলে গেছে। লালচাঁদবাবু এসেই দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন, আমার অনুমতিও নিলেন না। রুপোবাঁধানো ছড়িটা রাখলেন চেয়ারের এক পাশে। ওঁর নিঃশ্বাসে অল্প-অল্প সুরার গন্ধ ছিল, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলুম।

লালচাঁদবাবু, একদৃষ্টে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, কাল আপনি আমার বাসায় গিয়েছিলেন ?

অস্বীকার করা মূর্খতা, বললুম গিয়েছিলুম।

আমার স্ত্রীকে পরীক্ষা করেছেন ?

সেটাও স্বীকার করলুম।

লালচাঁদবাবু কিছুক্ষণ চুপ থেকে ছড়িটা ঠুকঠুক নাড়লেন। হঠাৎ জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ঠিক জানেন ডক্টর, আপনার কোন ভুল হয়নি, যা ভেবেছেন তাই ঠিক !

সবিনয়ে বললুম, সামান্য কেস, এ-সব ব্যাপারে ভুল হবার তো কথা নয়। তাছাড়া আপনার স্ত্রীর স্টেটমেণ্টের সঙ্গেও আমার সিদ্ধান্ত মিলে যাচ্ছে।

লালচাঁদবাবু বললেন, হুঁ। চেনঘড়িতে সময় দেখে আপন মনেই বললেন, আশ্চর্য।

বললুম, উকিলসাব, বিচলিত হচ্ছেন কেন। বরং খুশী হবার কথা। বংশলোপ থেকে বেঁচে গেলেন।

লালচাঁদবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল না, যা আশা করেছিলুম। গুম হয়ে বসে রইলেন, ছড়িটা প্ল্যানচেটের পায়ার মত নিজে থেকেই যেন নড়তে থাকল।

তারপরেই লালচাঁদবাবু একটা নাটকীয় কাণ্ড করলেন। খুলে ফেললেন গায়ের আলপাকার কোট, হেঁট হয়ে পায়ের জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে

বললেন, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে ডক্টর। আমার স্ত্রীকে পরীক্ষা করেছেন, আমাকেও পরীক্ষা করতে হবে।

হতভম্ব হয়ে বললুম, কেন।

ততক্ষণ লালচাঁদ পায়ের মোজাও টানতে শুরু করেছেন. ছড়িটা ঠক করে পড়ে গেল মাটিতে। তাড়াতাড়ি ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। বললুম, ব্যস্ত হবেন না, কী ব্যাপার, আমাকে সব বলুন তো।

উত্তেজনায় লালচাঁদের সর্বদেহ কাঁপছে, সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরও, বললেন, আমার স্ত্রীর সন্তানধারণের ক্ষমতা আছে জেনেছেন, কিন্তু সন্তান-দানের শক্তি আমার আছে কিনা সেটাও জেনে নিন ?

বেশি ঔৎসুক্য প্রকাশ না পায় এমন গলায় বললুম, সে-শক্তি আপনার নেই, ভাবছেন কেন।

ততক্ষণে শ্রান্তিতে লালচাঁদবাবুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে, ছড়িটা ফের কুড়িয়ে নিয়েছেন, অবসন্ন গলায় তাঁকে বলতে শুনলুম, জানি বলেই ভেবেছি। মনের অগোচরে যেমন পাপ নেই ডাক্তারবাবু, তেমনি রোগও নেই। আপনাকে লুকোব না, কম বয়সে শরীরের ওপর অত্যাচার করেছিলাম। আপনাদের কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে নাকি আঠার ঘা, কিন্তু এক ঘায়েই আমাকে নিষ্ফলা করে গেছে।

রোমাঞ্চিত বোধ করলুম। চিকিৎসা ব্যবসায়ে এর পরে বহু লোকের বহু স্বীকারোক্তি শুনতে হয়েছে, কিন্তু প্রাকটিসের প্রথম পর্বে অর্ধ-পরিচিত শাঁসালো একটি উকিলের ভাঙা-ভাঙা জবানবন্দী শুনে গায়ে যে কাঁটা দিয়েছিল, সে-অনুভূতিটুকু এখনও ভুলিনি।

লালচাঁদবাবুকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কী করে জানলেন।

সুরাপানে ঈষৎ-লালচে চোখ দুটি কিছুক্ষণ আমার মুখে ন্যস্ত করে লালচাঁদ চুপ করে রইলেন। ধীরে ধীরে বললেন, আমি আগেও একবার ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিলুম। তিন তিনজন স্পেশালিস্ট, তারা কিছু লুকোয়নি। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল, ভোগের ক্ষমতা আমার অটুট থাকবে, কিন্তু সন্তানের পিতৃত্ব কখনও পাব না।

হাত বাড়িয়ে লালচাঁদ এক গ্লাস জল চাইলেন, এনে দিলুম। গলা ভিজিয়ে লালচাঁদ ফের শুরু করলেন, কিন্তু দময়ন্তী এ-কাজ কেন করল ডাক্তারবাবু, আমি তো ওকে ঠকাতে চাইনি। বিয়ের পরই ভয়ঙ্কর কথাটা

যেই জেনেছি, অমনি নিজেকে দূরে দূরে রেখেছি। দময়ন্তীর শরীরটা নষ্ট করতে চাইনি।

মনে মনে হাসলুম। একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করে দেহটা বাঁচানোর যুক্তির মধ্যে যে ফাঁকি আছে সেটা এই অনুতপ্ত প্রায়-প্রৌঢ় লোকটিকে ধরিয়ে দিলুম না।

লালচাঁদ বলে গেলেন, দময়ন্তী কিছু জানত না। নিজের খেয়াল-খুশি নিয়ে মেতে থাকতে ওকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছি। সারাদিন মামলা নিয়ে ব্যস্ত থাকার ভান করেছি। সন্ধ্যাটা কাটিয়েছি······ধরুন ক্লাবে। মদ ফের ধরেছি, রাত্রে ও ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপেটিপে চোরের মত বিছানায় উঠেছি।

জেরা করলুম, প্রতিজ্ঞা কোনদিন ভাঙেন নি ?

স্পষ্ট, নগ্ন প্রশ্নে লালচাঁদবাবু শিউরে উঠলেন, আপনা থেকেই ওঁর মাথা নুয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে বললেন, ভেঙেছি। আমি পশু হতে পারি ডাক্তার, কিন্তু মানুষও তো। এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে পাঁচবার কি ছয়বার। কিন্তু তাতেও তো এই ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়।

নীরস গলায় বললুম, কেন।

নোয়ান মাথা নেড়ে নেড়ে লালচাঁদ বললেন, আমার রক্ষিতাও ছিল। লখনৌতে একজন, বনারসে একজন, একজন দেহ্‌লিতে। কিন্তু তারাও কোনদিন সন্তান-সম্ভবা হয়নি ডাক্তার।

আমি কোন মন্তব্য করলুম না, লালচাঁদবাবু নিজেই দম নিয়ে বললেন, অথচ দময়ন্তী হল, সামান্য একবার কি দু'বারের সঙ্কল্পচ্যুতি, তাতেই। তাই তো আমি আবার নিজেকে পরীক্ষা করাতে এসেছি ডাক্তার, ভাল করে জেনে নিতে চাই, সেই স্পেশালিস্টরা কি সেদিন তবে ভুল করেছিল।

লালচাঁদ গুপ্তকে সেদিন পরীক্ষা করতে হয়েছিল। ছোট ডিসপেনসারি, সাজ-সরঞ্জাম অল্প। যথাসাধ্য করলুম। বললুম, রিপোর্ট কাল দেব।

রিপোর্টে অপ্রত্যাশিত কিছু ছিল না। নিঃসংশয়ে জেনেছিলুম স্পেশালিস্টদের ভুল হয়নি।

সে-রিপোর্ট অবশ্য লালচাঁদবাবু পাননি। কেননা, কয়েকটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা অতঃপর ঘটে গেল। পরদিন সকালেই শুনলুম দময়ন্তী নিরুদ্দেশ। বিষণলাল আমাকে ফিসফিস করে জানালে, রতনলালেরও খোঁজ নেই। গুজব দুয়ে দুয়ে চার করলে।

পুলিশ-কোর্টের বড় উকিল নিজে, কিন্তু পুলিশের শরণ নিলেন না, গা ঢাকা দিলেন। সপ্তাহখানেক পরে খবর পেলুম তিনিও শহর ছেড়েছেন।

আমি জানি, এ কাণ্ড না ঘটলেও লালচাঁদ আমার কাছে রিপোর্ট নিতে আসতেন না। সুরার প্রভাবে দ্রবীভূত চিত্ত নিয়ে গভীর রাত্রে অপরিচিত একটি ডাক্তারের কাছে জীবনের গোপন রহস্য উন্মোচন করেছিলেন,—সেটা নেহাত সাময়িক বৈকল্য; দিনের আলোয় তার কাছে মুখ দেখাতে পারতেন না।

এর বছরখানেক পরে আমিও বুলন্দশহরের পাট তুলে আগ্রা চলে আসি।

এই আগ্রাতে আমি যদি ওদের দেখা না পেতুম তবে দময়ন্তী চরিত্রের অনেকটাই আমার কাছে অনাবৃত থেকে যেত।

চিপিটোলার ডিসপেনসারিতে বসে আছি, বিকেল থেকে টিপটিপ বৃষ্টি, ডিসেম্বরের শেষ, কনকনে হাওয়া, হাড়ে ছুঁচ-বেঁধা শীত। রাস্তায় পুরু কাদা, লোকজনের যাতায়াত বিরলতর হয়ে এসেছে, সেদিনকারমত ঝাঁপ বন্ধ করব কিনা ভাবছি হঠাৎ ফোর্টের বাসের আড্ডার দিক থেকে একটা হল্লা শুনতে পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট বন্ধ হতে থাকল, শুনলুম দু'দল মাতালে দাঙ্গা বেধেছে। শোরগোলটা এদিকেও আসছিল, বাইরে তো যাওয়া যাবে না. আমিও ভিতর থেকে দরজা এঁটে দিলুম। ফটফট সোডার বোতল তো ভাঙছেই, ছোরাছুরিও চলছে শুনলুম, পটকাও ফাটছে।

দুরদুর বুকে বসে আছি, মনে হল হল্লাটা যেন আমার দরজার সামনে পৌঁছেই স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটু পরেই দরজায় টোকা পড়ল, একটি দুটি নয়। অস্থির হাতের। সেই সঙ্গে আর্ত চিৎকার, ডক্টরসাব ডক্টরসাব!

দরজা খুলতেই হল। দেখি দাঙ্গাকারীর দল মোড় অবধি এগিয়ে গেছে, রাস্তাভরতি এখন কাচের টুকরো। অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল সিঁড়ির উপরে একটা লোক হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, তার কানের পাশ দিয়ে একটি শীর্ণ রক্তের ধারা গড়িয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি তাকে তুলে ধরলুম। মোড়ের দিকটা লালে লাল, পুলিশ এসেছে। লোকটাকে ভিতরে এনে প্রাথমিক-চিকিৎসা করলুম। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই লোকটা চোখ মেললে। আঘাত গুরুতর নয়,

লোকটা মূর্ছা গিয়েছিল প্রধানত ভয়ে। চোখ মেলেই ক্ষীণ কণ্ঠে একবার বললে পুলিশ—

বললুম, পুলিশ আসবে না। তুমি এখানে আছ, বা দাঙ্গার দলে ছিলে কেউ টের পাবে না। ঠিকানা বল, আমি তোমাকে বাসায় পৌঁচে দেবার ব্যবস্থা করছি।

লোকটা আবার চোখ বুঁজলে। জড়িতস্বরে বললে, টের পাবে। মন্নুজানই ওদের বলে দেবে। বলতে বলতে ওর মুদিত চোখের পাতা দুটিই ঘৃণায় কুঞ্চিত হল। দাঁতে দাঁত ঘষে লোকটা উচ্চারণ করলে—থাক, কুৎসিত শব্দটা লিখে কাজ নেই।

পণ্য-রমণীর ঘরে এরকম হাঙ্গামা মাঝে মাঝে হয়, জানি। তারই কয়েকটা টুকরো আজ সদর রাস্তায় ছিটকে এসেছে। আঁতুড়ে বাচ্চার মুখে যেমন মধু দেয়, লোকটার জিভেয় তেমনি কয়েক ফোঁটা ব্রাণ্ডি ঢাললুম। কিছুক্ষণ পরে চাঙ্গা হয়ে ও বললে বাড়ি যাব।

বললুম, একা তোমাকে এ-অবস্থায় ছাড়তে পারিনে। ঠিকানা আমাকে দাও। তোমার বাড়িতে খবর দিচ্ছি।

লোকটা আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, তখনও স্নায়ুভীতি-বশে থেকে-থেকে কাঁপছে, উঠতে চেষ্টা করল, ব্যর্থ হয়ে বলল, আচ্ছা।

লোক মারফত খবর পাঠালুম। লোকটার বাসার ঠিকানা রাজা-কি মণ্ডির কাছাকাছি। ওকে নিতে প্রায় এক ঘণ্টা বাদে একটা স্ত্রীলোক নামল। মাথায় ঘোমটা, বেশভূষা সাধারণ। তবু দেখামাত্র চমকে উঠলুম, চিনলুম।

দময়ন্তীও আমাকে চিনেছিল নিশ্চয়। সেই গভীর রাতে ওষুধের দোকানে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কয়েকটা কথা ওকে বলতে হয়েছিল, কিন্তু মাথার ঘোমটা খসতে দেয়নি, মুখের একাংশ আড়াল করে রেখেছিল।

এসেই দময়ন্তী ধপ করে মাটিতে বসে পড়েছিল। রতনলালের ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথাটা কোলে টেনে নিয়েছিল। ক্ষতটাও একটু টেনেটুনে হয়ত দেখত, যদি না আমি ধমক দিতুম।

বুলন্দশহরের মহিলাটির আভিজাত্যের কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই। বার বার আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় চোট লেগেছে ডক্টর-সাব, ভয়ের কিছু নেই তো।

বললুম, ভয়ের কিছু নেই। সামান্য ক্ষত। হঠাৎ রাস্তায় পা পিছলে পড়ে গিয়ে—

ঘোমটায় মুখ ঢাকা, তবু দময়ন্তীর মুখের বাঁকা হাসিটুকু অনুভব করলুম। —মিছিমিছি আমাকে ভোলাচ্ছেন বাবুসাব, আমি সব জানি। ও মন্নুজানের ওখানে গিয়েছিল। আজ তলব পেয়েছে যে। ওই খারাপ মেয়েটাই ওকে খাবে।

দময়ন্তীর মুখে কয়েকটা ঘৃণার রেখা ফুটে উঠবে ভেবেছিলুম। কিন্তু দেখলুম, আশ্চর্য মমতায় ও রতনলালকে জড়িয়ে ধরেছে, ওর উপর ভর রেখে আহত লোকটি কোনমতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দময়ন্তী পিছন ফিরে একবার বললে, বাবুজী এবার নিয়ে যাই ?

ওর হাতে একটা ওষুধ দিলুম। বললুম জ্বর হতে পারে। পরিচর্যা সম্পর্কে ভারিক্কি ডাক্তারি চালে কয়েকটা পরামর্শ দিলুম।

ভাবলুম ওখানেই ব্যাপারটা চুকে গেল, কিন্তু যায়নি। পরদিন সকালে দোকানের ঝাঁপ খুলতে না খুলতেই দময়ন্তীর চিরকুট এসে হাজির, এখুনি একবার যেতে হবে।

পুলিশ কেসে জড়িয়ে পড়ব ভয় ছিল, তবু গেলুম। অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে তবে ওদের বস্তি। বস্তিই বলব, দুর্গন্ধ খোলা নর্দমা ঘিরে সারি সারি খাপরার ঘরকে আর কী বলা চলে।

বাইরে বারান্দায় একটি শিশু মাটি ঘাঁটছে, তার গায়ে এক গাছি সুতোও নেই। আমার জুতোর শব্দে চমকে সে কেঁদে উঠল। ছায়াচ্ছন্ন ঘরখানির মধ্যে ব্যাণ্ডেজবাঁধা মাথা নিয়ে রতনলাল শুয়ে, তার শিয়রে দময়ন্তীকে বসে থাকতে দেখলুম। কাল রাতে মুখ লুকিয়েছিল, আজ ঘোমটার চিহ্নটুকু নেই। আমাকে চিনেছে সেটা স্বীকার করতে সংকোচ নেই, আমি পাছে চিনে ফেলি সে ভয়টুকুও নেই।

বললুম, কেমন আছে, এখন।

ম্লান হেসে দময়ন্তী বললে, ভাল। কাল সারারাত কিন্তু ছটফট করেছে। ভুলও বকছিল।

বললুম, ও কিছু না। রতনলালের নাড়ি ধরলুম। বাইরের বাচ্চাটা তখন থেকে ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে, থামেনি। ইশারায় রতনলাল দময়ন্তীকে বলল,

বাচ্চাটাকে ধরতে। ওকে কিছু খেতে দিয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন তো ডক্টরসাব।

জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন ছিল না। উপবাসী শিশুর মুখ দেখলেই চেনা যায়।

রতনলাল বললে, মা তো নয়, শয়তানী। কাল সারারাত বাচ্চাটা কেঁদেছে তবু আমার শিয়র থেকে ওঠেনি। এত বেলা পর্যন্ত ওকে একটা রুটিও খেতে দেয়নি। মেয়েলোকটার দয়া মায়ার নামমাত্র নেই ডক্টরসাব।

নতুন ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে লিখে দিয়ে চলে আসছি,—দময়ন্তী আমার পিছন-পিছন এল। সারা মুখে আতঙ্ক আর উদ্বেগ লেখা। জিজ্ঞাসা করলে, ও তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে তো ডক্টরসাব, ফের কারখানায় যোগ দিতে পারবে?

ভেবেছিলুম একান্তে ডেকে ওকে কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব। করিনি, রুচিতে ঠেকল। একদা সেরা-উকিলের ঘরণী যদি কারখানার মজুরের রমণী হয়ে সুখী হয়ে থাকে, হোক। জেরায় জেরায় ওকে বে-আব্রু করে কাজ নেই।

আমার হাতে দুটি টাকা দিয়ে দময়ন্তী বললে, আপনাকেই খবর দিলুম বাবুজি, অন্য কাউকে ডাকতে ভরসা পাইনি। আপনি কালকের ব্যাপারটা জানেন, অন্য কেউ হয়ত পুলিশকে জানিয়ে দিত।

পুলিশকে মন্নুজানই জানিয়েছিল। তিনদিনের দিন দময়ন্তী শুকনো মুখে এসে জানালে রতনকে ধরে নিয়ে গেছে, সে এখন জেল হাসপাতালে।

উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, মামলায় কী হবে ডক্টরসাব?

—কী আর, বড়জোর জেল।

মাথা নিচু করে দময়ন্তী কী যেন ভাবলে। আঁচল থেকে একজোড়া দুল টেবিলে রেখে বললে, এই আমার শেষ সম্বল বাবুজি, আর কিছু নেই।

বুঝলুম, দময়ন্তী মুখোশ এবার খসাবে, তারই সুযোগ খুঁজছে। হাতের আন্দাজে দুল দুটোর ওজন নিয়ে বললুম, উকিলের খরচ এতেই কুলিয়ে যাবে।

হঠাৎ ভেঙে পড়ল দময়ন্তী, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। আপনি তো সব জানেন ডক্টরসাব, আপনাকে কিছু লুকোব না। দু'হাজার টাকা নিয়ে এসেছিলুম, এ দু'বছরে সব গেছে। অনেক বলেও ওকে মানুষ করতে পারলুম না। সেই নেশা সেই বাইরের মেয়েমানুষের ওপর টান—

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, তুমিও তো ওর ঘরের আউরত নও, দময়ন্তী।

দেখলুম দময়ন্তীর মুখ সাদা হয়ে গেছে, থর থর কাঁপছে। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে দময়ন্তী বললে, কিন্তু আমি ওকে ভালবাসি।

এবারে না হেসে পারলুম না। ভালবাসাই যদি সব রোগ আর পাপের দবাই হত দময়ন্তী, তবে পৃথিবীতে এত ডাক্তার আর পুলিশের দরকার হত না।

রতনের মাসখানেকের মত জেল হয়েছিল জানতুম, কিন্তু ওর খালাসের দিনটি মনে রাখিনি। একদিন সকালে ডিসপেনসারি খুলতে গিয়ে সিঁড়িতে ওকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। মাথার ঘা শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু শরীরটা আরও শুকনো, গর্তে লুকন চোখ দু'টির দৃষ্টি তীব্রতর।

বললুম, কী ব্যাপার, কবে ছাড়া পেলে। আবার দাঙ্গা করবার মতলব নাকি।

ঠাট্টাটা গায়ে মাখলে না, উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বললে, ডাক্তরসাব, একবার আমাদের বাসায় যেতে হবে। বাচ্চাটার খুব অসুখ।

রোগী ফিরিয়ে দিতে পারি, তখনও এমন পসার হয়নি। বললুম, চল।

আবার সেই দুর্গন্ধ খোলা নর্দমা, নিচু-নিচু অন্ধকার খাপরার চালা। দময়ন্তীকে দেখতে পেলুম না। দাঁতে দাঁত ঘষে রতনলাল বললে, বেড়াতে বেরিয়েছে। ছেলেটা জ্বরে ধুকছে, কোন হুঁশ যদি থাকে। জানেন ডক্টরসাব, মেয়েমানুষটার মত বদমাশ দুনিয়ায় দুটি নেই। বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে পণ করেছে।

বললুম, সে-কী।

—নয়ত কী। অসুখটা আর কিছু তো নয়, আমি যে ক-দিন জেলে ছিলুম ওকে ভাল করে খেতে পর্যন্ত দেয়নি। বাইরে বাইরে ফেলে রেখেছে, বুকে বাচ্চাটার সর্দি বসে গেছে। এই যে এখন এত জ্বর, একবার দেখে? বাচ্চাটাকে আমি বুকে আগলে আগলে রাখি। জেনানার কল্‌জে এত শক্ত হয়, কোথাও শুনেছেন?

মাসখানেক আগে এই বাসাতেই রতনলালের শিয়রে সেবারত দময়ন্তীকে দেখেছিলুম। সে-কথা আর তুললুম না।

নিউমোনিয়া হয়েছিল, পরদিনই বাচ্চাটা মারা গেল। মৃতদেহটা বুকে জড়িয়ে রতনলালকে আকুল হয়ে কাঁদতে দেখেছি। দময়ন্তী একটু দূরে

দাঁড়িয়েছিল। ঠাণ্ডা, নিশ্চল; ভাবলেশহীন। ওর চোখে বিন্দুমাত্র জল দেখিনি।

সেদিন দময়ন্তীকে ঘৃণা করেছিলুম। সব খুইয়েছে, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় মমতাটুকুও দময়ন্তী কেন হাতে রাখেনি।

আজ পাঁচ বছর পরে খরস্রোত ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, এ-প্রশ্নটার উত্তর সেদিনই দময়ন্তীর কাছে জেনে নিলে হত। আজ সময় নেই। সেদিন এক মজুরের ঘরনীকে অসংকোচে যে-কথা জিজ্ঞাসা করা চলত, আজ বিশিষ্ট জমিদারের অঙ্কশায়িনীর কাছে তার ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া বেআদপি। সমাজের অলিখিত আইন এমনি।

হোটেলের বারান্দায় চেয়ার টেনে বসে আছি। কুয়াশা কেটে যায়; আবার জমে। মেঘের ভাঁজে ভাঁজে কাঁপা-কাঁপা আলোর তরঙ্গ। সূর্যোদয়ের প্রাক্‌মুহূর্ত।

দরজায় টোকা পড়ল, পিছনে চেয়ে দেখি ওমপ্রকাশ গুপ্ত। বলিষ্ঠ দেহ, পায়ে নাগ্‌রা, চুমড়ানো গোঁফ।

নমস্কার করে বললে, আমি একবার লছমনঝুলায় যাচ্ছি ডক্টরসাব। দুপুরেই ফিরব।

বললুম, আপনার স্ত্রী এখন কেমন।

—একটু ভাল। ওষুধ সব ডোজই দিয়েছি, ঘুমোচ্ছে। একটু নজর রাখবেন। তীর্থদর্শন করতে এসেছিল, পারল না, অসুখে পড়ল। বেচারা! একটু নজরে রাখবেন।

প্রতিশ্রুতি দিলুম, রাখব।

—মেহেরবানি, বলে ওমপ্রকাশ বিদায় নিলে।

সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই এদিকের বারান্দায় কার ছায়া পড়ল। চেয়ে দেখলুম, দময়ন্তী।

আসবে, জানতুম। কিন্তু এত শীঘ্র, ভাবিনি। এতক্ষণ তবে ঘুমোয়নি, ঘুমের ভান করে পড়েছিল।

বললুম, আসুন মিসেস ভার্গব।

আগ্রার বস্তীতে অনায়াসে তুমি বলেছি, কিন্তু হরিদ্বারের হোটেলে যথা-বিহিত সম্মান না দেখিয়ে পারলুম না।

—কেন, ভয় হল মিঃ ভার্গবকে সব বলে দেব ?

দময়ন্তী মাথা তুললে। মুখখানির ঢলঢলে দৃষ্টিটুকুই অবশিষ্ট আছে, বললে, ও সব কথা জানে না ডক্টরসাব, ওকে কিছু বলবেন না।

নীরস হেসে বললুম, সব কথা তো আমিও জানিনে দময়ন্তী। শুনতে চাই। রতনলালের কী হল, তাকে ছাড়লে কেন।

আবার দময়ন্তীর মুখ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। অস্ফুট গলায় বললে, আমি তো ছাড়িনি, সেই আমাকে ছেড়ে গেছে।

ইঙ্গিতে দময়ন্তী ওপরদিকে দেখিয়ে দিলে, বুঝলুম, কোথায়।

জিজ্ঞাসা করলুম রতনের কী হয়েছিল।

—শরাব খেয়ে খেয়ে ওর শরীরে কিছু ছিল না ডক্টরসাব। শেষতক, তাতেই গেল।

রূঢ় গলায় বললুম, সে মরে যেতে না যেতে অন্য পুরুষের আশ্রয় নিলে ? তুমি না তাকে ভালবাসতে দময়ন্তী।

দময়ন্তী জলটলমল আয়ত দুটি চোখ তুলে তাকাল।

—বাসতুম বাবুজী, এখনও বাসি। কিন্তু আপনি যা ভেবেছেন সে-ভাবে নয়।

যেন বিদ্যুতের চমক খেলুম। সেভাবে নয়, তবে কী ভাবে রতনলালকে ভালবেসেছিলে দময়ন্তী ?

মাথা নিচু করে দময়ন্তী বললে, ছেলের মত।

নিজের সমস্ত সত্তাকে প্রবল কণ্ঠে হেসে উঠতে শুনলুম।—রতনলালকে তুমি ছেলের মত ভালবাসতে দয়মন্তী ? অথচ তারই সঙ্গে পালিয়েছ, বছরের পর বছর ঘর করেছ, সবই কি—

বাধা দিয়ে দময়ন্তী বললে, সত্যি। আপনারা যা দেখেছেন তা সত্যি ডক্টরসাব, শুধু যা ভেবেছেন সেটুকু ঝুটা। ততক্ষণে দময়ন্তী নিজেকে শক্ত করেছে, চোখে কান্নার বাষ্পমাত্র নেই। নম্র অথচ স্পষ্ট গলায় বলল, আমাকে কেউ বোঝেনি ডাক্তারজী, আমার স্বামী না, রতন না, আপনিও না। একটু দরদ থাকলে বুঝতেন, বিয়ে করেও যে-মেয়ে কোলে ছেলে পায় না তার দুঃখ। একটু ভেবে বলুন তো বাবুজী, আমি কী পেয়েছি। স্বামী ? সে আমাকে কোনদিন ছেলে দিতে পারত না।

বললুম, তাই বলে,—

বাধা দিয়ে দময়ন্তী বললে, আমাকে বলতে দিন। সে-দুঃখও আমি ভুলতে রাজি ছিলুম। আপনি তো জানেন বাবুজি, পরের ছেলেমেয়ে আমি আপন করতে কী না করেছি। রতন যখন এল ওর বয়স তখন সতের, আমার বাইশ। সুন্দর কচি মুখ, ওকে আমি মায়ের মত ভালবাসলুম। মনে হল টাকা আর সামাজিক মান আমাকে যে-শান্তি দেয়নি, এতদিনে তা পাব। স্বামীসুখ পাইনি, পুত্রসুখ পাব।

অবিশ্বাস উবে গিয়েছিল, রুদ্ধশ্বাসে বললুম, তারপর?

দময়ন্তী ম্লান হাসলে।—আমার নসিবে কোনটাই ছিল না বাবুজী। রতন আমাকে সে-চোখে দেখলে না। ওর ওপর আমার টানের অন্যরকম অর্থ করলে। প্রথম প্রথম বুঝিনি। সুযোগ পেলেই ও যখন তখন আমাকে জড়িয়ে ধরত, অস্বস্তি হত, তবু চটিনি, ভাবতুম ছেলেমানুষ। পরে বুঝেছিলুম ও অল্প বয়সেই বিগড়েছে। কিন্তু বুঝলেই স্নেহ সঙ্গে সঙ্গে উবে যায় না বাবুজী। ওকে বাধা দিতুম, বোঝাতে চেষ্টা করতুম, ও বুঝতে চাইত না। মাথা নেড়ে নেড়ে বলত, আমি জানি তুমি ভয় পাচ্ছ, তোমার মনের কথা অন্য। নইলে কেন তুমি আমাকে এত টাকা দাও, রোজ খাবার নিয়ে আমার জন্য বসে থাক। আমাদের গাঁয়ের অনেক মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছি, এ-সব টানের মানে জানি। মেয়েদের সব রীতি আমার জানা আছে, পেটে খিদে মুখে লাজ।

শুনে শরীর কাঠ হয়ে যেত, ভাবতুম ঠাস করে একটা চড় মারি। কিন্তু কচি মুখখানার দিকে চেয়ে সব ভুলে যেতুম। সেই মায়াই আমার কাল হল। একদিন অন্ধকারে আমার বিছানায় এসেছিল, স্বামী তখন মফঃস্বলে। চেঁচিয়ে উঠতে যাব, ও আমার মুখে হাত চাপা দিলে। বললে, বাধা দিলে পালিয়ে যাবে, বিষ খাবে। ওকে বরাবরের মত আমি হারাব। সে-কথা বিশ্বাস করলুম, আমার নীতির শিকড়সুদ্ধ নড়ে গেল। একটি মাত্র সুখ আমার, একটি মাত্র শান্তি, তাও যাবে?

হঠাৎ দময়ন্তী থামল। ঠোঁটের কোণ শুকনো, চোখের মণি বালি-ধুধু প্রান্তরের মত জ্বলছে। ঠোঁট দুটি আলাদা হতেই তিতো একটু হাসি ঝরে পড়ল।—বাকিটা আর নিজমুখে বলব না ডক্টরসাব। যাকে ছেলের মত ভালবাসি তাকে কাছে রাখতে তার সন্তানের মা পর্যন্ত হতে হল। সেই গ্লানিটুকু কল্পনা করে নিন।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলুম না। নিচের রাস্তাটা জেগে উঠেছে, মিনিটে মিনিটে হর্ন বাজিয়ে ছুটছে হৃষিকেশের বাস। হরকি-পৌড়িতে স্নানার্থীদের কলরব বাড়ছে। লাঠি-লোটা সম্বল কাতারে কাতারে পথচারীর স্রোতও দেখছি। দূরের পাহাড়ের ঢেউ লক্ষ্য করে হাঁটি-হাঁটি এগোচ্ছে। শ্রীনগর, কীর্তিনগর, রুদ্রপ্রয়াগের পথে কবে কেদার-বদরী পৌঁছবে, এরাই জানে।

এতক্ষণে সেই প্রশ্নটা করবার সুযোগ পেলাম।

—গ্লানি ছিল বলেই বুঝি বাচ্চাটাকে ভালবাসতে পারলে না, দময়ন্তী? অনায়াসে মরে যেতে দিলে?

দময়ন্তী চমকে উঠল। ফ্যাকাশে মুখে চেয়ে বললে, কে বললে।

—কে আবার বলবে। আমার চোখ দুটো তো বন্ধ ছিল না।

দময়ন্তী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না, শাড়ির পাড় আঙুলে জড়াতে লাগল। খানিক পরে আস্তে আস্তে বলল, ভালবাসবনা কেন, বাসতুম। কিন্তু কি জানেন, ওকে দেখলেই নিজের ওপর কেমন ঘেন্না হত, মরে যেতুম। আর…বোধ হয় হিংসেও করতুম। রতনকে ও আমার কাছ থেকে আরও দূরে নিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ অস্বাভাবিক দ্রুত গলায় দময়ন্তী বলে উঠল, আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন, ও যখন পেটে এল, রতনলাল তখন ভয় পেয়েছিল… ওকে নষ্ট করতে চেয়েছিল। অথচ কোলে যখন এল, রতনলাল সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল। নিজের ছেলে তো, পাগলের মত ভালবাসত বাচ্চাটাকে।

ধীরে ধীরে, কিন্তু নির্মম গলায় বললুম, সে তো তোমারও নিজের ছেলে ছিল দময়ন্তী।

মাথা তেমনি নীচু, শাড়ির পাড়ে আঙুল জড়াতে জড়াতে দময়ন্তী বললে, ছিল। কিন্তু প্রথম সন্তান তো নয়।

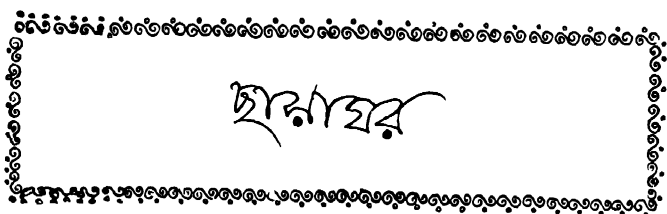


ক বেলা পাঁচটায় মোটরটা এসে সদরে দাঁড়ায়। হর্ন নেই, ধীরে ধীরে থামে বলে ব্রেক-কষা বা রাস্তায় চাকা-ঘষার শব্দ টুকুও শোনা যায়। এক জোড়া জুতো সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরে উঠে আসে, পুরু, কালো পর্দার বাইরে ভারি কিন্তু ভীরু গলা শোনা যায়: 'আসতে পারি ?'

সে-গলা প্রণতির চেনা। তাড়াতাড়ি সুব্রতর শিয়র থেকে উঠে দাঁড়ায়। চুলে চিরুনি বুলনোর দরকার নেই, মুখে গলায় হালকা পাউডার ছিটনোরও না, কেন না ঘর অন্ধকার, বেশবাস বিন্যস্ত থাকলেই হল।

মৃদু গলায় বলে, 'আসুন, ডাক্তার মৈত্র।'

বিকেলের মরা আলো ঘরের মধ্যে একবার ঝলসে উঠেই মিলিয়ে যায়। বোঝা যায় ডাক্তার ঘরে এসেছে। পর্দাটা যথাস্থানে ফিরে একটু একটু



কাঁপতে থাকে। অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় বিছানা থেকে দুর্বল কিন্তু তীক্ষ্ণ একটি কণ্ঠ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে: 'কে।'

ডাক্তার বলে, 'আমি'। পরিচিত ঘর, অন্ধকারেই সে তার নিজের আসনটি খুঁজে পায়। বিছানার পাশেই ছোট টেবিলে মেজার গ্লাস, শিশি, মালিশের কৌটো রাখা, তবু ঠোকর খেতে হয় না। আগের মতই ভারি কিন্তু ধীর গলায় ডাক্তার আবার বলে 'আমি'। তুমি ঘুমোওনি সুব্রত ?'

বিরক্তিসূচক একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে সুব্রত পাশ ফেরে বোঝা যায়। বালিশে মুখ গুঁজে অস্থির ভাবে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, 'না, না, না।' তুমি আবার কেন এলে ডাক্তার।'

এই প্রশ্নে ডাক্তার কি একটু চমকে যায়! কয়েকটি মুহূর্ত একটি টিক্‌টিক্‌-ঘড়ির কাঁটা ঘুরে ঘুরে সেকেণ্ডের জপমালা গোনে। তারপর কৈফিয়তের সুরে ডাক্তারকে বলতে শোনা যায়, 'তোমাকে দেখতে আসি সুব্রত।'

বালিশে মুখ ঢাকা, সুব্রত একটি খিল খিল হাসি চাপতে চেষ্টা করছে কিনা, স্পষ্ট বোঝা যায় না। শুধু তার পরিহাস-লঘু গলা শোনা যায়—'এই অন্ধকারে আমাকে কি দেখা যায় ডাক্তার?'

ডাক্তার বুঝি বলতে চেয়েছিল 'অন্ধকার তো তোমার ভালোর জন্যেই সুব্রত' কিন্তু কানের পাশে অস্বস্তিতে কয়েক গাছি চুড়ি রিনরিন করে উঠতেই ডাক্তার থেমে গেল। এই অন্ধকারে প্রণতির উপস্থিতিটা অশরীরী অনুভূতিমাত্র ছিল, এতক্ষণে সেটা যেন শ্রুতিতে, অন্তত একটি ইন্দ্রিয়ের বোধে, ধরা দিয়েছে।

আবার সেই ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ কিছুক্ষণ। এতক্ষণে অন্ধকারও যেন ফিকে হয়ে এসেছে, ছায়া-ছায়া একটি দেহ-রেখা দেখা যাচ্ছে বিছানায়, কুণ্ঠিত, সন্দিগ্ধ, লুপ্তপ্রায়। আপন মনেই মাথা নেড়ে নেড়ে সুব্রত ব'লে গেল, 'অন্ধকারে আমাকে দেখা যায় না। আয়্যাম্‌ কিং অব্‌ দি ডার্ক চেম্বার। তুমি 'রাজা' পড়েছ ডাক্তার।'

ডাক্তার পড়েনি। পড়লেও এ-প্রশ্নের জবাব দিত না।

অনেকক্ষণ কারো কোনো কথা শোনা গেল না। ঘর শুধু অন্ধ নয়, বোবাও। একটি ঘড়ি, দু'টি চুড়ি, আর সব চুপ। সেই চুড়ির দিকে চেয়ে ডাক্তার বললে, 'এই ওষুধগুলোই রিপীট হবে। প্রেসক্রিপশনটা দিন, লোকের হাতে পাঠিয়ে দেব।'

বিছানার নীচে থেকে প্রণতি একটা কাগজ বার করে ডাক্তারের হাতে তুলে দিল। অঙুলে আঙুলে ঠেকল! চমকে উঠল ডাক্তার। এতক্ষণ যাকে চোখে দেখতে পায়নি, তাকে স্পর্শ দিয়ে দেখল।

আর বসে থাকার অর্থ নেই। ডাক্তার খানিকটা বসে থেকে থেকে শুধু মেজেয় জুতো ঘষল।

'তুমি একটু ঘুমোও সুব্রত। ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবে।' বিড়বিড় করে সুব্রত বলল, 'ম্যাকবেথ শ্যাল স্লীপ নো মোর। আর ভয়ের কথা কী বলছ। ভয় আমি পাইনে। কাউকে না, কিছুতেই না। এই যে, তুমি রোজ রোজ আসছ, তবু কি ভয় পেয়েছি ডাক্তার?' বলতে বলতে হেসে

উঠল সুব্রত, মুখভঙ্গি অন্ধকারে দেখা গেল না, কিন্তু তীক্ষ্ণ কয়েকটি তীর ডাক্তারের মর্মভেদ করে যেন সম্মুখের দেয়ালে বিদ্ধ হল।

তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাইরে এল। এসেও কেন যে বিমূঢ় এক পল দাঁড়িয়ে রইল সে নিজেই জানেনা। সে কি ভেবেছিল যতক্ষণ কপাল আর ঘাড়ের ঘাম রুমালে মুছবে ততক্ষণ পর্দার ওপাশে খালি দুটি পা এসে দাঁড়াবে, দু'গাছি হালকা চুড়ি বেজে উঠবে, আর মৃদু একটি কণ্ঠ বলবে, 'আবার আসবেন?'

সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে যায় ডাক্তার। মোটর-ইঞ্জিনটা স্পর্শমাত্র প্রাণ পেয়ে থরথর কাঁপে। মুখ বাড়িয়ে ডাক্তার একবার হয়ত উপরে, জানলার দিকে তাকায়, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। ভুলটা টের পেতে কিছুমাত্র দেরি হয় না। জানালার ফোকরও যে পুরু পর্দায় ঢাকা—আশ্চর্য, এই কথাটা তার মনে ছিল না?

সুব্রত অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এই নিষ্ঠুর সত্যটা প্রণতি প্রথম বিশ্বাস করেনি, ওষুধের পর ওষুধ বদলেছে, ডাক্তারের পর ডাক্তার। দীর্ঘ আট বছর ধরে দিনের পর দিন নিজেকে শুধুই সান্ত্বনা দেবার কাহিনী।

আজও যখন হঠাৎ একদিন বিকেলে আকাশ মেঘে ছেয়ে আসে, রাস্তার শীর্ণ উপোসী নিমগাছটার ন্যাড়া ডাল থেকে থেকে কাঁপে, একরাশ হু হু ধুলো সহসা এই সদাস্তিমিত ঘরে ঢুকে প'ড়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, ছায়া ঘনতর হয়, পাতা ছিঁড়ে গিয়ে ক্যালেণ্ডারটা পৃথিবীর বয়স নিমেষে দু'মাস বাড়িয়ে দেয়, প্রণতি জানালার পাট বন্ধ করবে কি, পর্দাটাকেও একপাশে সরিয়ে আনে, দু'টি শিকের ফাঁকে মুখখানি চেপে ধ'রে ফোঁটা ফোঁটা বর্ষার জল মাখে। ঝাপসা আকাশটা এখন কোন নিকূল নদীর মত, তার ওপারে চেয়ে থেকে থেকে আরও একটি দিনের কথা মনে পড়ে।

রেজেস্ট্রি অফিস থেকে ওরা নাম সই করে যেদিন রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল সেদিনও এমনি ঝর্ঝর বৃষ্টি। প্রণতি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এবার?'

সুব্রত বলেছিল, 'চল আমাদের বাড়ি। বাবা মাকে সব বলি। তাঁরা নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করবেন।'

আশীর্বাদ তাঁরা করেন নি। ফের যখন ওরা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল তখনও টিপ টিপ থামেনি। প্রণতিকে আবার বলতে হল, 'এবার ?'

'চলো তোমাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসি।' ওদের বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত প্রণতিকে পৌছে দিয়েছিল সুব্রত। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত টেনে নিয়ে বলেছিল, 'আজ আর ওপরে যাবনা। তুমি একটি মাস আমাকে সময় দাও, লক্ষ্মীটি।'

এক মাস নয়, সব ব্যবস্থা করতে সুব্রতের মাত্র কুড়ি দিন সময় লেগেছিল। ছোট কলেজে একশো পাঁচিশ টাকা মাইনের চাকরি। ছোট্ট, দেড়খানা ঘরের বাসা, চল্লিশ টাকা ভাড়া। ওরা যেদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে এ-বাসায় উঠে এসেছিল, আশ্চর্য, সেদিনও সারা বিকেল জুড়ে একটানা একঘেয়ে বৃষ্টি। কয়েকটি বর্ষার সন্ধ্যার সঙ্গে প্রণতির জীবনের কয়েকটি ঘটনা এমন একাঙ্গ মিশে আছে !

অল্প আয়, ভাল চলত না। আপন লোকেরা সবাই পর হয়ে গিয়েছিলেন, কেউ কোন খোঁজ খবর নেননি। মাঝে মাঝে সুব্রতর কয়েকজন বন্ধু আসত, একেকটি সিঁদুর-সন্ধ্যা চায়ের ধোঁয়া আর সিগারেটের ছাইয়ে ভরে দিয়ে চলে যেত।

তারপর তাদেরও আসা-যাওয়া কমে গেল। কেননা, আয় বাড়াতে সুব্রতকে তিনটে ট্যুইশনি নিতে হল। রাত জেগে লিখতে হত ছাত্রবন্ধু নোট। উদয়াস্ত, অস্তোদয় খাটুনি। প্রাণ রাখার প্রাণান্ত প্রয়াস। বিকিয়ে গেল অনেক সোনা-সকাল, অভ্র-দুপুর, রুপোলী-বিকেল—সব ক'টি মুহূর্ত যেন এক দুশ্ছেদ্য লৌহরাত্রির দেয়ালে বন্দী।

একদিন দুপুরে দু'টো না বাজতেই সুব্রত কলেজ থেকে ফিরে এল। প্রণতির মনে আছে সেদিন সিঁড়িতে অকাল পদধ্বনি শুনে সে অবাক হয়েছিল।—'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে তুমি ? আজ কলেজে কম কাজ ছিল বুঝি। চল না একটু ঘুরে আসি। কতদিন আমি এই ঘরখানি ছেড়ে বেরোইনি বল তো।'

উত্তর না দিয়ে সুব্রত সটান বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। চোখ দু'টি ঢেকে বলেছিল, মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা। একটু টিপে দেবে ?

শুধু যন্ত্রণা নয়, জ্বর। সেই জ্বর একুশ দিন পর ছেড়েছিল। আবার কাজে যোগ দিল সুব্রত, কিন্তু আগেকার মত উৎসাহে নয়। ট্যুইশনি

ছাড়তে হল দু'টো, নোট লেখাও। বলত, 'বেশি খাটতে পারিনে। পিঠে লাগে। চোখ জ্বালা করে।'

প্রণতি বলল, 'কাজ নেই খেটে। এই টাকাতেই আমি বেশ চালিয়ে নিতে পারব।'

সেই নীল-নির্মল শীতের বিকেলটির কথা প্রণতির মনে আছে। সুব্রত ঘরে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে ওকে ডাকল, 'শোন, শোন, শুনে যাও।'

তাড়াতাড়ি চায়ের কেতলি ফেলে উঠে এল প্রণতি। শুনল বিরক্ত গলায় সুব্রত বলছে, 'জানালাটা বন্ধ করে রেখেছ কেন। কিছু পড়তে পারছি না।'

জানালা বন্ধ? অবাক হয়ে প্রণতি একবার খোলা জানালা একবার সুব্রতর চোখের দিকে চেয়ে রইল। প্রতিবাদ করতেও ভুলে গেল। অসহায়ের মত সুব্রত কেবলি থেকে থেকে মাথা নাড়ছে আর বলছে 'খুলে দাও, খুলে দাও। কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'ভাল করে একবার চেয়ে দেখ তো।'

চোখ রগড়ে উঠে বসল সুব্রত, বলল, 'তাইতো। অথচ আমি ভেবেছিলাম ঠাণ্ডা কালো অন্ধকারে ঘরখানা ভরে গেছে? একটা অক্ষরও পড়তে পারছিলাম না। কিন্তু বৃষ্টি নেমেছে তুমি দেখতে পাওনি প্রণতি? জলের ঝাপ্টায় এখুনি ভেসে যাবে যে। বন্ধ করে দাও, বন্ধ করে দাও জানালা।'

জানালার সামনে গিয়ে প্রণতি বলল, 'কোথায় বৃষ্টি। এখনো আকাশে রোদ রয়েছে, তুমি দেখতে পাওনা?'

'রোদ?' করুণ, ভয়ার্ত চীৎকার করে সুব্রত বলল, 'এখনও রোদ আছে? অথচ আমি যে স্পষ্ট দেখছি প্রণতি, সব ঝাপসা হয়ে গেছে, ফোঁটা ফোঁটা জল চুইয়ে পড়ছে আকাশ থেকে।'

'দেখছ?'

সুব্রত নিজেকেই নিজে বিশ্বাস-না-করা গলায় বলল, 'দেখছি।'

প্রণতি আর কোন কথা না বলে, এতটুকু শব্দ না করে, জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিল।

ডাক্তার এল, ওষুধ। অন্য ডাক্তার, অন্য ওষুধ। কিন্তু সুব্রতর দৃষ্টিভ্রম ঘুচল না। অসুখটাই ধরতে পারলেন না কেউ। একজন ক্যালশিয়মের

ঘাটতি ভেবে ইনজেকশনের পর ইনজেকশন দিলেন, আর ভিটামিনের অভাব মেটাতে পুষ্টিকর খাবারের ফর্দ; সেই ফর্দ হাতে করে প্রণতি কিছুক্ষণ পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, কলেজ থেকে দীর্ঘ ছুটি নিতে হয়েছে সুব্রতকে, শেষ ট্যুইশানিও গেছে।

একদিন শুধু প্রণতি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বাবা মাকে খবর দিই ?'

নিমীলিত চোখ দুটির নীচে সুব্রতর চিবুকের পেশি কঠিনতর হয়েছিল। বলেছিল, 'না।'

সুব্রত অন্ধ হয়ে যাবে।

স্পেশালিস্ট ডাক্তার ফিসফিস করে এই নিষ্ঠুর নিয়তির কথা প্রণতিকে জানিয়েছিলেন। আশ্চর্য, তবু ভিজিটের টাকা তুলে দেবার সময় প্রণতির হাত কাঁপেনি।

স্পেশালিস্ট ভরসা দিয়েছিলেন, 'একেবারে হতাশ হবেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অপ্‌টিক্যাল নার্ভগুলো সব মরে গেছে বটে, তবে পরিপূর্ণ বিশ্রাম পেলে আবার সব ঠিক হতেও পারে। এ রোগের ডাক্তার হল সময়, আর ওষুধ হল রেস্ট এ্যাণ্ড পীস।'

দরজা জানালায় গাঢ় কালো ঢাকনা, সুব্রতর দৃষ্টি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে, আলোতে যন্ত্রণা বাড়ে।

এই ডাক্তার এসেছে আরও অনেক পর। চাপা-ভয় ছায়া-ঘরে ক্ষয়িষ্ণু রোগীর শিয়রে ইতিমধ্যে প্রণতির একটির পর একটি দিন কেটে গেছে, মাসের পর মাস। সাহায্যক্লান্ত বন্ধুরা ততদিনে বিনা নোটিসে আসা-যাওয়া বন্ধ করেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। নোট প্রকাশকেরা মাঝে মাঝে যে টাকা পাঠায়, তাতে কোনমতে বাড়ি ভাড়া কুলোয়, হয়ত ঠিকে ঝির মাইনেও, তার বেশি কিছু না। চিকিৎসা বন্ধ, প্রণতির নিজস্ব গোপন সঞ্চয়ও খালি হয়ে এসেছিল।

এই ডাক্তার এসেছিল তারও পর। সেদিনও হর্ন দেয়নি, সরাসরি উপরে এসে দরজায় টোকা দিয়েছিল।

ঠিকে ঝিটার তখন কী কাজে বাইরে। পর্দা ঠেলে প্রণতিকেই বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। মিনিট খানেক কোন কথা বলেনি ডাক্তার। নির্নিমেষ নির্লজ্জ চোখে প্রণতিকে খুঁটিয়ে দেখেছিল।

সেই দৃষ্টি প্রণতি সহ্য করতে পারেনি। আগন্তুকের মুখের উপরই দরজা বন্ধ করে দেবে কিনা হয়ত একবার তাও ভেবেছে। এই তো ক'মাস মাত্র বাইরের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে নিরালোক ঘরখানায় অহরহ আশ্রয় নিয়েছে প্রণতি, এরই মধ্যে কি এমন পাণ্ডুরতা এসেছে তার কপোলে যে পুরুষের চোখে সে আর শায়া-শাড়ি-মোড়া রক্ত মাংসের মেয়ে নয়, ডিসেকশন টেবিলের নাবরণ একটা শরীর মাত্র ?

'এটা কি সুব্রত রায়ের বাসা ?' ডাক্তারের প্রশ্নে বিমূঢ়তা কেটেছে, কোনমতে 'হ্যাঁ আসুন' বলে এক রকম ছুটে প্রণতি ফের ঘরে গিয়ে লুকিয়েছে।

ডাক্তারও এসেছে পিছে পিছে।

'কে ?' হঠাৎ ঘুম ভেঙে সুব্রত চেঁচিয়ে উঠেছিল। ওর বিছানার এক পাশে বসে ডাক্তার বলে, 'আমাকে চিনতে পারলে না সুব্রত ? অথচ কলেজে একসঙ্গে কত দিন—'

সুব্রতর শীর্ণ মুখে একটু হাসির আভাস দেখা দেয়। ধীরে ধীরে বলে, 'বোধ হয় চিনেছি। দেখতে তো ভাল পাই না। শুধু গলা শুনে বুঝতে চেষ্টা করি। তুমি বিলেত থেকে কবে ফিরলে অরুণ ?'

ডাক্তার বলে, 'বেশি না, এই তো ক'মাস। তোমার খবর অনেক দিন খোঁজ করেও পাইনি। সেদিন একজন ঠিকানাটা দিলে। আজই আসবার ফুরসত পেলুম। তোমার কিছু হয়নি সুব্রত, আমার হাতে যখন পড়েছ তখন সেরে যাবে। আর ভয় নেই।'

আস্তে আস্তে সুব্রত বলল, 'না, আর ভয় নেই।'

সুব্রতকে অনেকক্ষণ ধরে ডাক্তার পরীক্ষা করেছিল। বহু দিন পরে আলো জ্বলেছিল সেই ঠাণ্ডা বন্ধ ঘরে। পরীক্ষা-শেষে ডাক্তার বলেছিল, 'সুইচটা অফ করে দিন। এখানে ভাল বুঝতে পারলাম না। ওকে একদিন আমার চেম্বারে নিয়ে যেতে হবে।'

দু' বন্ধুর গল্প সেদিন সহজে ফুরোয়নি। ডাক্তার উঠে দাঁড়াতেই সুব্রত বলেছিল, 'একটু ব'স, কত দিন পরে দেখা হল। একেবারে একা থাকি।'

একা থাকি। সুব্রতর কণ্ঠস্বরের হাহাকারটুকু হয়ত ডাক্তারের অন্তর স্পর্শ করে থাকবে। অন্তত তখনই উঠতে পারেনি।

প্রণতি রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে জানালার সমুখে দাঁড়িয়েছে। শুনল স্ব্রত জিজ্ঞাসা করছে, 'ডাক্তার, এখনও বিয়ে করনি ?'

এই প্রশ্নের উত্তর শুনতে প্রণতিও কেন-যে আড়চোখে ফিরে চেয়েছিল, সে নিজেও জানে না।

'ন্-নাঃ, কই আর করলুম।' অতি মৃদু নিরুত্তাপ গলায় ডাক্তার বললে। সেই নিস্পৃহতায় প্রণতি চমকে উঠেছিল। স্ব্রত যদি জিজ্ঞাসা করত, 'আজ বিকেলে চা খাওনি ?'—ডাক্তার তখনও হয়ত এই স্বরেই বলত, 'নাঃ, কই আর খেলুম।'

'বিয়ে করলে না কেন।'

তরল গলায় ডাক্তার বলে উঠল, 'আই'ড হ্যাভ্ বীন এ ফুল ইফ আই ডিড্।' তবু প্রণতির মনে হ'ল, এই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীটা খাঁটি নয়, এই চমকটুকু ধার-করা।

স্ব্রত তবু ছাড়ল না।

'তোমার সেই দূর-সম্পর্কের আত্মীয়াটির খবর কী ডাক্তার। তাকে বিয়ে করলে না কেন।'

স্পষ্টই বোঝা যায়, ডাক্তার অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। প্রণতি ওকে রুমাল বার করে একবার কপাল ঘাড় মুছতে দেখল।

'ও-কথা থাক, স্ব্রত।'

বাইরে শেষ-বর্ষার ধারা, অল্প-অল্প হাওয়া। স্ব্রত বলল, 'বল না, ডাক্তার, একটু শুনি।' বাদলা আবহাওয়ায় পুরনো বয়ম খুলে যেন আচার খেতে ছেলে-মানুষী সাধ হয়েছে স্ব্রতর, ডাক্তারের মানা শুনবে না।—'কোথায় যাবে এমন দিনে। আর একটু ব'স। কী হল সেই মেয়েটির।'

ভীত, কুণ্ঠিত চোখে এ-প্রসঙ্গে অনিচ্ছুক ডাক্তার বার বার ওর দিকে চেয়েছে, প্রণতি টের পেয়েছে। তারপর বহু প্রয়াসে ডাক্তার যেন একটা রূঢ় কথা বলবে বলে নিজেকে তৈরি করে নিল। 'এতদিনে নিশ্চয়ই স্ব-জননী, স্ব-গৃহিণী হয়েছে। টাকার অভাবে এক বছর আমি মেডিক্যাল ফাইন্যাল দিতে পারিনি। সে-বছরই সে মোটা মাইনের একজন সিনিয়র কেরানীকে বিয়ে করল। কেননা—' অত্যন্ত তিক্তস্বরে ডাক্তার বলল; 'কেননা, আমার সামনে তখন নিশ্চিত কোন কেরীয়র নেই। মেয়েরা শুধু সিকিওরিটি চায় স্ব্রত, সেদিন ওকে আমি তা দিতে পারিনি।'

'শুধু সিকিওরিটি চায় ?'

নিজের কথা বলে ফেলতে পেরে ডাক্তারের সঙ্কোচ কেটে গেছে, ঈষৎ-উত্তেজিত কণ্ঠে তাকে বলতে শোনা গেল, 'হোআট্ এল্‌স্।' বলেই চকিতে জানালার দিকে তাকাল, সেখানে তখনও একটি নতমুখ মেয়ে, ডাক্তার হয়ত বুঝল কথাটি স্থানোচিত হল না, তাড়াতাড়ি যোগ করে দিলে, 'অন্তত সেই মেয়েটি চেয়েছিল।'

'সেই মেয়েই সব মেয়ে নয় ডাক্তার।'

অন্ধপ্রায় স্বামীর সঙ্গে থাকবে বলে এই প্রায়ান্ধ, আলো-নিঙড়ানো ঘরখানি যে বেছে নিয়েছে, সেই মেয়েটিকে ডাক্তার আরেকবার দেখে নিল। অতি ধীরে বলল, 'হয়ত নয়।'

তারপর সেদিন যত কথা বলেছে ডাক্তার, সব সুব্রতর সঙ্গেই, কিন্তু বার বার এদিকে ফিরে ফিরে চেয়েছে। দৃষ্টি যার লোপ পেতে বসেছে, তার সঙ্গে কথা বলার সুবিধা এই, অন্য দিকে চোখ ফেরালেও সে টের পায় না।

সেদিন অত সহজেই সুব্রত ডাক্তারকে রেহাই দেয়নি। একটু পরেই আবার বলল, 'পাশ করবার পরে তুমি হাউস সার্জন হয়ে একটি নার্সের প্রেমে পড়েছিলে, গুজব শুনেছিলুম। তাকে বিয়ে করলে না কেন।'

আবার সঙ্কোচ বোধ করল ডাক্তার। তাড়াতাড়ি বলল, 'ওসব কথা থাক সুব্রত। সে-ই আমাকে বিয়ে করতে চায়নি। আমার সুপারিশ চেয়েছিল। মিশত কিছু সুবিধে পাওয়ার জন্যে, কেননা, ও তখনও টেম্পোরারি।' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ডাক্তার যোগ করল, 'অবশ্য এসব আমি অনেক দেরিতে বুঝতে পারি। বুঝে আর ভুল করিনি। সুপারিশ ওকে করেছিলুম, কিন্তু তিন মাস পরেই একটা গ্র্যান্ট নিয়ে বিলেত চলে গেলুম।'

এ-ঘরে আর দাঁড়িয়ে থাকা অশোভন, ওরা যখন লক্ষ্য করছে না সেই অবসরে প্রণতি পা টিপে টিপে পাশের আধখানা ঘরে গেল, যেটা কিছুদিন আগেও ছিল সুব্রতর লেখাপড়া করবার ঘর। গেল, কিন্তু একেবারে দূরে যেতে পারল না। দরজাটা একটু ফাঁকই রইল, তার ও পাশে উৎসুক দু'টি কান।

'আর কোন মেয়ে তোমার জীবনে আসেনি ?'

হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল ডাক্তার, এতক্ষণ কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মৃদু রেখেই কথা বলছিল, এবার বাঁধ ভাঙল। কাঁধ কুঞ্চন-প্রসারণের একটা

ভঙ্গী করে বলল, 'লট্স। জাহাজেই একটি মধ্যবয়সী মেয়ের সংস্পর্শে এসেছিলুম, নাম বলব না, তিনি আবার ছোটখাটো একজন দেশনেত্রী। ইনি কী চেয়েছিলেন জানো? না, টাকা নয়, প্রতিষ্ঠা নয়, অকারণে ভদ্রমহিলাকে বদনাম দেব না,—তাঁর নজর ছিল শুধু আমার পেশীবহুল শরীরাটর দিকে।'

বলে একটু বিরতি দিয়েছিল ডাক্তার, সেই অবসরে সুব্রত কথাটার কুৎসিত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে নির্বাক হয়ে গেল। কিন্তু ডাক্তারকে তখন নেশায় পেয়েছে, চোখ দু'টির পাতা দপ-দপ করছে। অতি দ্রুত কিন্তু চাপা গলায় বলে গেল, 'আরো ঢের এসেছে। বাট্ আই টেল য়ু, দে'র জস্ট এ লট্ অব ডাল্, ডলড্-আপ থিংস;—চীপ, চীপ্ চীপ্।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সুব্রত, আর সেই অবিশ্বাসের ভঙ্গীটাই যেন সম্বিৎ ফিরিয়ে দিল ডাক্তারের, হঠাৎ-ক্ষুব্ধ মানুষটি আবার নিস্তেজ হয়ে পড়ল, লজ্জিত মুখে বারবার চাইল পাশের ঘরের দরজার দিকে, ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার আসি।'

'একটু চা খেয়ে যাবেন না?' প্রণতি বেরিয়ে এসেছে খুপরি থেকে।

শুক্‌নো গলা, একটু ভিজিয়ে নিলে মন্দ হত না, ডাক্তার তবু বললে, 'না।'

মুখে মুখে দু চারটে উপদেশ ডাক্তার সেদিনই দিয়ে গিয়েছিল। রোগীকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। বেশি নড়া-চড়া বারণ। কোন রকম উত্তেজনা না। আর—

শেষ কথাটা খুব কাছাকাছি এসে, খুব চাপা গলায় ডাক্তার বলেছিল: 'এ্যাণ্ড য়ু মাস্ট হ্যাভ নো বেবীজ।'

লজ্জায়-কান-লাল প্রণতি তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গিয়েছিল। পর্দার বাইরে ডাক্তারের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারেনি। পুরু ভুরুর নীচে চোখ দুটি এমন কেন ডাক্তারের সবাইকে কেন অপারেশন টেবিলের রোগী ভাবে। বাইরে গিয়েও ডাক্তার এক-মুহূর্ত দরজার সমুখে কেন দাঁড়িয়েছিল কে জানে। সে কি ভেবেছিল আজকের প্রগল্‌ভতার জন্যে প্রণতির কাছে মার্জনা চেয়ে নেবে?'

তারপর থেকে প্রতিদিন রাস্তায় ওদের দরজার সামনে ডাক্তারের গাড়ি থেমেছে। ঠিক পাঁচটায় পরিচিত জুতোর শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে, দরজায় সন্তর্পণ টোকা দিয়ে বলে, 'আসতে পারি।'

ভিতর থেকেই প্রণতি সাড়া দেয়, 'আসুন।'

ডাক্তার বলে, 'কেমন আছ, সুব্রত।'

পাশ ফিরে তিক্ত গলায় সুব্রত বলে, 'ভাল, ভাল, ভাল।'

আশ্বাস দিয়ে ডাক্তার বলে, 'অত নার্ভাস হয়ে পড়েছ কেন। শীতকালটা আসুক। আমাদের হাসপাতালেই তোমার অপারেশন হবে। একেবারে সেরে যাবে দেখো।'

তারপর অনেকক্ষণ কোন কথা থাকে না। সুব্রতর কোন সাড়া নেই, মনে হয় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। অস্পষ্ট আলোয় একটি বুকের নিয়মিত ওঠা-পড়া দেখা যায়।

কখন এক সময় ডাক্তার উঠে পড়ে, বারান্দায় একটু-বা দাঁড়ায়। সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নামে।

ওদিকে ঘরের মধ্যে হঠাৎ সোজা হয়ে ব'সে সুব্রত জিজ্ঞাসা করে, 'ডাক্তার চলে গেল, প্রণতি?'

প্রণতি বলে, 'গেল। তুমি টের পেয়েছ?'

সুব্রত বলে, 'পেয়েছি। টের যে আমি সব পাই প্রণতি, সব দেখতে পাই। দেয়ালে পিঁপড়ে সারি বেঁধে চলে, তাও অনুভব করি।'

আন্দাজে আন্দাজে হাত বাড়িয়ে প্রণতির ঠোঁট দু'টি ছুঁয়ে সুব্রত ফের বলে, 'দেখতে পাই শুনে হাসছ বুঝি? সত্যিই আমি দেখতে পাই, বোধ হয় তোমাদের চেয়ে, আর সকলের চেয়ে, একটু বেশিই পাই। চোখ দুটি দিয়ে যা দেখা যায় প্রণতি, সে নেহাৎ ওপর-ওপর দেখা। রেটিনা, লেন্স, ক্যামেরার কারসাজি, ফোটোগ্রাফির মত শস্তা। আমার এখনকার দেখা কিন্তু অনেক গভীর, স্পষ্ট। ছোঁয়ায় দেখি, শোনায় দেখি, গন্ধে দেখি, স্বাদে।'

বলতে বলতে সুব্রত যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল, কাঠ হয়ে গেল প্রণতি। এখুনি বুঝি সুব্রত ওকে বুকের ওপরে টেনে নেবে, অধীর আঙুলে কপালের চুল সরিয়ে, স্বেদবিন্দুর স্বাদ নিয়ে, কণ্ঠতটের ঘ্রাণ নিয়ে ওর নতুন ধরনের দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষা দেবে।

থর-থর কাঁপতে থাকল প্রণতি, ভয়ে বুকের ভিতরটাও যেন হিম হয়ে গেল। অন্ধোপম মানুষটির আবেগও বুঝি অন্ধ, প্রণতি একবার ভাবল বাধা দেবে, পারল না, বাইরে সোঁ-সোঁ হাওয়ার ক্রুদ্ধ মুষ্টি, জানালার পাল্লা থেকে থেকে কাঁপে, সব প্রতিরোধ বুঝি এখুনি লুটিয়ে পড়বে, বিজুরির ছুরিতে

অন্ধকারের কলজে থেকে ফিনকি দিয়ে ম্লান-পিঙ্গল রক্ত সারা ঘরে ছড়িয়ে যাবে। বিবশ প্রণতি আতঙ্কে, সুখে, দু' হাতে চোখ ঢেকে দিলে।

সে-ঝড়ও থামল। শ্রান্ত সুব্রত ফের বালিশে মাথা রেখে ওর গালে তখনো-তপ্ত একটি হাত রাখল। আস্তে আস্তে বলল, 'ডাক্তারের কথা ভেবে ভয় পেয়েছ, না? ডাক্তারদের সব মানা মানতে নেই।'

মেঘ-শ্রাবণ, শিউলি-আশ্বিন কেটে গিয়ে হিম-অঘ্রান আসে। ঋতুরঙ্গের কোন ছাপ এই ছায়া-ঘরখানিতে পড়ে না। বড় জোর কোন দিন বৃষ্টির ফোঁটায় জানালার পর্দা ভিজে ওঠে, কোন দিন বা হালকা হাওয়ায় একটু কাঁপে, কোন দিন গাঢ় নীল সোনালী একটু ছোঁয়া লাগে।

হর্ন না বাজিয়ে গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে আর দিনের পর দিন সিঁড়ি ভেঙে ডাক্তার একদিন যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, সাহস পায়। প্রেসক্রিপশনটা প্রণতির হাতে তুলে দিতে গিয়ে সেদিনও আঙুলে আঙুলে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়, কিন্তু ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গেই হাত সরিয়ে নেয় না, মৃদু অলক্ষ্য একটু চাপ দেয়।

সাড়া আসে না। পাবে সে আশাও সে করেনি। কী বলবে আগে কিছু ঠিক করে রেখেছিল, এখন এই মুহূর্তে সে সব মনে পড়ল না, ভাঙা ভাঙা গলায় কোনমতে বলল, 'একটু বাইরে আসবেন?'

এই ঘরে শুধু ছমছম ভয়, সব কিছু মৃত, নিরনুভূতি, এখানে কথা নেই, ডাক্তার তাই প্রণতিকে বাইরে ডেকেছে।

'বাইরে!'

ওই একটি শব্দে ডাক্তার উত্তর পেয়ে গেল। ঘরে আলো থাকলে দেখতে পেত প্রণতির মুখে এতটুকু রক্ত নেই। ওর হাতে রাখা হাতখানিতে কাঁটা দিয়েছে অনুভব করল, পাছে সেই হিম-আতঙ্ক তার দেহেও সঞ্চারিত হয়, সেই ভয়েই বুঝি ডাক্তার তাড়াতাড়ি হাতখানি ছেড়ে দিল।

আস্তে আস্তে পর্দা ঠেলে বাইরে এল ডাক্তার। সেই সিঁড়ি, আবার ধাপে ধাপে নামা, সদরে নিঃশব্দ সেই গাড়ি।

ডাক্তার চলে যাবার পর ঘড়ি-টিকটিক-প্রাণ ঘরখানিতে প্রথম সুব্রতর স্বর শোনা গেল।

'ডাক্তার কী বলছিল প্রণতি।'

প্রণতি কিছু বলল না, সুব্রত নিজেই ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল, 'আমি জানি কী। তোমাকে বাইরে যেতে বলেছিল।'

দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর সুব্রত আবার বলল, 'গেলেই পারতে। কেন তুমি নিজেকে এভাবে শেষ করে দিচ্ছ প্রণতি। কেন এই কানা-ঘরে দিনরাত নিজেকে লুকিয়ে রেখেছ। আমার জন্যে? কিন্তু একটিবার আলোর মুখ দেখলে ক্ষতি কী।'

মাটির দিকে চোখ রেখে প্রণতি আস্তে আস্তে, শব্দগুলোকে জিভ দিয়ে প্রায় না ছুঁয়ে বলল, 'ভয় করে।'

ভয়, এত ভয়? নিঃশব্দ একটা হাসিতে সুব্রতর মুখের রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠল,—তুমি জান না, ভয়ের এই বাড়াবাড়িটাকেই আমার বেশি ভয়।

পরদিন ডাক্তার আসেননি। বিকেল গড়িয়ে ডুবে গেল সন্ধ্যার দহে, কিন্তু সদরে পরিচিত গাড়িটি দাঁড়াল না, দীর্ঘ তু'বছরের অভ্যাসে ছেদ পড়ল।

'প্রণতি।'

প্রণতি মুখ ফিরিয়ে বিছানার দিকে তাকাল।

'জানালার পাশে কী করছ। আজ সারা বিকেল একবারও তো আমার কাছে এসে বসলে না।'

সুব্রতর শিয়রে এসে বসল প্রণতি।

'মাথায় বড় যন্ত্রণা। একটু টিপে দেবে?'

শিরা-ওঠা কপালে কয়েকটি কোমল আঙুল ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হতে থাকল, রাত্রি বাড়ছে। রাস্তায় হঠাৎ হর্ন শুনে প্রণতির হাত পলকের জন্যে থেমেছিল। সুব্রত বলল, 'থামলে কেন। ডাক্তার নয়। ডাক্তারের গাড়ির তো হর্ন বাজে না।'

লজ্জায় প্রণতি মাটিতে মিশিয়ে যেতে চাইল।

তবু যতবার সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা গেল, ততবার আড়ষ্ট হয়ে উঠল প্রণতি, আর কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকল, আজ যেন না আসে, আর যেন না আসে।

ওর মনের কথাটি পড়ে নিয়ে সুব্রত যেন বলল, তুমি যা ভাবছ তা নয়, ডাক্তারকে তুমি ভুল বুঝেছ। এ ঘর ছেড়ে বেরোও না, একটা রোগীর

বিছানার সঙ্গে দিনরাত লেগে রয়েছে, তোমার শরীর-মনের পক্ষে এ ভাল নয়। ধৃতরাষ্ট্রের জন্যে গান্ধারী চোখে ঠুলি পড়েছিলেন, এ নজীর পুরাণেই মানায়।'

একটু থামল সুব্রত। অনেক পরে আবার বলল, 'ডাক্তারকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। মেয়েদের কাছে এলেই সর্দি লেগে যাবার মত মন ওর নয়। অনেক মেয়ে ওর জীবনে এসেছে—কিন্তু কী আশ্চর্য জান, কোন মেয়েই ওর মনে ছাপ রাখতে পারেনি।'

'কেউ না?' কখন আপনা থেকেই চুলে আঙুল বুলনো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, প্রণতি টের পায়নি। বলল, 'কেউ না?'

সুব্রত বলল, 'না। ও যা খোঁজে, কোন মেয়ের মধ্যে তা পায়নি। দু'দিনেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শোননি, সেদিন বলছিল, চীপ্, চীপ্, চীপ্? কিন্তু এত জোর দিয়ে মাথা টিপছ কেন প্রণতি। তুমি কি ক্ষেপে গেলে!'

তারপর একদিন সুব্রতর পৃথিবী থেকে আলো একেবারে মুছে গেল।

ভিয়েনা থেকে স্পেশালিস্ট এসেছিলেন। অপারেশনও হয়েছিল, কিন্তু সফল হয়নি। হাসপাতাল থেকে ওরা গাড়ি করে সুব্রতকে ফের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল, ধরাধরি করে তুলে আনল সিঁড়ি বেয়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখল প্রণতি। ওরা চলে যেতে সুব্রত ইশারায় প্রণতিকে কাছে ডাকল। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথাটা মড়ার খুলির মত, বিবর্ণ ঠোঁট দুটির ফাঁকে সাদা দাঁত-গুলো আরও বীভৎস। ঘর্ঘর ভাঙা গলায় সুব্রত বলল, 'হল না প্রণতি, শেষ বাজিও হেরে গেলুম।'

প্রণতির হাত দুটি নিয়ে মুখের উপরে রেখেছে সুব্রত, শুকনো কড়া ...ড়ের খসখসে স্পর্শে প্রণতি আড়ষ্ট হয়ে গেছে। মৃদু কণ্ঠে সুব্রত বলল, 'তোমাকে কখনও জানতে দিইনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার আশা ছিল আবার আলো দেখব। তোমাকে দেখব।'

আলো দেখব। তোমাকে দেখব। আহত একটি কণ্ঠ ছায়া-ঘরের দেয়াল থেকে দেয়ালে প্রতিহত হল। ধীর গাঢ় কণ্ঠে সুব্রত বলল, 'চোখ দুটো গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রুতি-ঘ্রাণ-স্পর্শ, আর বোধগুলোও গেল না কেন প্রণতি। তবে বুঝি বেঁচে থাকতে এত কষ্ট হত না।'

প্রণতি ভেবেছিল সান্ত্বনা দেবে, সুব্রতর কপালের ঘর্মাক্ত ভয়টুকু মুছে দিয়ে বলবে, 'চুপ কর, চুপ কর,' কিন্তু কথা ফুটল না, টের পেল ভরসার

শেষ পাতাটিও খসে যেতে তার নিজের গায়েও কখন কাঁটা দিয়েছে ; সেই ছায়াচ্ছন্ন ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেয়, নির্বাক, রোমাঞ্চিত, বসে রইল। পট্টিবাঁধা মিছে চোখ দুটির নীচে ঠোঁট কাঁপছে—প্রণতি শুনতে পেল সুব্রত বিড়বিড় করে বলছে, কোন মানে নেই, এই নিরিন্দ্রিয় দেহে প্রাণটুকু পুষে রাখার কোন মানে নেই।

তারপর সেই দীর্ঘতম রাত্রিটি এল :

শেষ রাত্রে রুদ্ধ বিকৃত গলার আর্তনাদে প্রণতির ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল। জানালার পর্দা কখন সরে গিয়েছিল, হলদে এক টুকরো জ্যোৎস্নায় ঘর ভরে গেছে। সুব্রতর মুখে ফেনা, মড়ার খুলির মত ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথটা খাট থেকে সরে গিয়ে নীচে ঝুলছে, তলপেট প্রচণ্ড আক্ষেপে অস্থির, আলগা হাতের মুঠিতে চোখের মলমের শিশিটা। ঢাকনা খোলা। কাল এটাকে সরিয়ে রাখেনি প্রণতি ?

অস্ফুট একটা চীৎকার করে প্রণতি নীচে নেমে এল, মোড়ের মুখেই পাড়ার এক ডাক্তারের বাসা, দরজায় ঘন ঘন ঘা দিল। ডাক্তারকে জাগিয়ে তুলতে সময় কম লাগল না। চোখে-মুখে জল দিয়ে সব সরঞ্জাম নিয়ে তিনি যখন হাজির হলেন, ততক্ষণ সুব্রতর মুখের ফেনা শুকিয়ে গেছে, তলপেট স্থির, মলমের কৌটোটা মুঠি থেকে খসে মেজেয় গড়াচ্ছে।

তারপর একটু একটু করে আলো ফুটল আকাশে, সকাল হতে না হতেই লোকজন এল, প্রতিবেশী, পুলিস, খবরের কাগজের রিপোর্টার। নোট বই খুলে ওরা প্রণতির জবানী নিলে।

আবার ওরা ধরাধরি করে সুব্রতকে নামালে নীচে। মর্গের গাড়িটা একবার গর্জন করে উঠেই রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রয়োজন নেই, তবু পর্দাগুলো টেনে দিল প্রণতি। খাটের পায়া ধরে নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

সদরে হর্নহীন গাড়িটা এসে দাঁড়ানোর আভাস পাওয়া গেল আরও অনেক পরে। সিঁড়ি বেয়ে এক জোড়া জুতো উপরে উঠে আসছে।

দেহ আড়ষ্ট, তবু কোন মতে থরথর পায়ে উঠে প্রণতি দরজায় খিল তুলে দিল।

কবাটে টোকা। মৃদু কণ্ঠ, 'দরজা খুলুন প্রণতি দেবী।' ডাক্তারের গলা। এসেছে।

আসবেই, প্রণতি জানত।

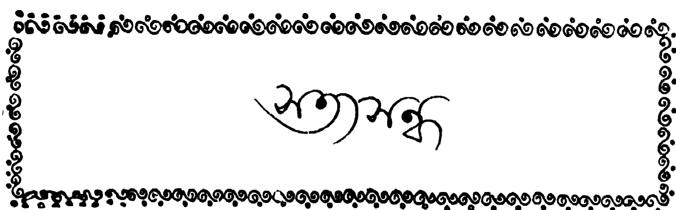
আবার করাঘাত। 'দরজা খুলুন।'

প্রণতি তবু উঠল না, আরও শক্ত করে খাটের পায়া চেপে ধরল। ডাকুক ডাক্তার, ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যাক, প্রণতি ওকে কিছুতে আজ এ ঘরে আসতে দিতে পারবে না। এই বিছানায় আজ কোন নিশ্চক্ষু প্রহরী নেই, ডাক্তার ঢুকেই হয়ত নিষ্ঠুর হিংস্র হাতে পর্দাগুলো সরিয়ে দেবে, হয়ত-বা ছিঁড়ে ফেলবে, এতদিনের চুপ-চাপ অপেক্ষার শোধ নেবে। রক্তের মত গলগল স্রোতে ভেসে যাবে এই চোর-কুঠুরি। সেই আলোয় কাকে দেখবে ডাক্তার। ছমছম চির-গোধূলি ঘরে যার হাতে হাত ঠেকলে কেঁপে উঠত, দেখবে সেই রহস্যময়ী কোথাও নেই। অন্ধকার ঘুচলেই যে মেয়েটিকে ডাক্তার দেখে ফেলবে সেও নিতান্ত সাধারণ। নার্সের মত, দেশ নেত্রীর মত, দূর সম্পর্কের সেই আত্মীয়ার মত। দেখবে, এও সামান্য, সুখলোলুপ, ডাক্তারের মানা না মানার লক্ষণ শরীরে স্পষ্ট।

কী করে প্রণতি দরজা খোলে।


স্তায় নেমেই ডাক্তার হনহন ক'রে চলতে শুরু করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে প্রবীরের প্রাণান্ত। এক রকম ছুটতে হ'ল।

এ-গলিতে গাড়ি ঘোরানো শক্ত হ'ত। টু-সীটরটা ডাক্তার তাই মোড়ের কাছে রেখে এসেছিলেন। গাড়ি লক্-করা, অতএব ব্যস্ততা সেজন্যে নয়। আসলে তিনি এই গলিটাই তাড়াতাড়ি পার হ'তে চান। গলির শেষে জীর্ণ একতলা বাড়িটা, এইমাত্র যেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। এখনো নড়বড়ে দরজাটা হাঁ ক'রে আছে। তার পিছনে কালো-পাথর অন্ধকার। অস্বস্তি সে-জন্যেও নয়। রাস্তার দিকের একমাত্র জানালার ফাঁক দিয়ে এক জোড়া ভীত-শীতল চোখ পিছে-পিছে তাড়া করে এসেছে, ফিরে না চেয়েও ডাক্তার



পিঠে সেই শিকারী দৃষ্টি অনুভব করলেন। মোড়ে পৌঁছে গাড়িটাকে যতক্ষণ স্টার্ট না দিলেন ততক্ষণ অস্বস্তিটুকু গেল না।

প্রবীর এতক্ষণ ভরসা ক'রে একটা কথাও বলেনি। পেট্রোলের ধোঁয়ার ভিজে ন্যাতায় পিছনের গলিটাকে একেবারে লেপে মুছে গাড়িটা যখন সদর রাস্তায় পড়ল, তখন সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন দেখলেন স্যার?'

জীবনে বহু রোগী দেখেছে ডাক্তার, যতবার দর্শনীর টাকা বুক পকেটে পুরেছেন ততবার এই প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। প্রায় সর্বত্র নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলতে হয়েছে 'ভাল। ভয়ের কারণ নেই।'

স্টীয়ারিঙে ন্যস্ত মনোযোগ, সমুখে প্রসারিত পথের উপর দুই চোখ, ডাক্তার আজও সংক্ষেপে বললেন 'ভাল'। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন এই বাঁধা জবাবে

কুলোবেনা। রোগ নয়, রোগীণীকে কেমন দেখলেন, প্রবীরের আসল প্রশ্ন তাই। ডাক্তার হঠাৎ স্পীড কমিয়ে দিলেন. আবার বাড়ালেন, ইঞ্জিনের গর্জনের স্রোতে কোনমতে ভেসে-থাকা গলায় বললেন, 'ভাল, ভালই তো। সামান্য সর্দিজ্বর, তুমি এতেই ঘাবড়ে গিয়েছিলে ?'

প্রবীর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর ভীরু স্বরে বলল, 'মীরাকে কেমন দেখলেন তা কিন্তু বলেন নি।'

'মীরা ? মেয়েটির নাম মীরা বুঝি ?'

প্রবীর অভিমান-ধরা গলায় বলল, 'স্যারের কিছু মনে থাকে না। ওর নাম তো কতবার বলেছি। ঐ তো রোগা একরত্তি মেয়ে, জানেন, সমস্ত পরিবার-টার ভার ওর ওপরে ?'

'তাই নাকি।'

নিরাসক্ত, কোনমতে ঠেকাদেওয়া ভঙ্গি। প্রবীর যেন আহত হ'ল। ঝোঁক দিয়ে বলল, 'চলছেই তো। ওর বাবার কত আর আয়। মীরার রোজগারে অন্তত বাড়িভাড়া, রোজকার বাজার খরচ চ'লে যায়।'

স্টীয়ারিঙে চোখ রেখে ডাক্তার এবারও বলতে যাচ্ছিলেন, 'তাই নাকি', তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন। প্রবীর, বেচারা, এতটা ওর সহ্য হবে না। বললেন, 'তবে তো ওর বিয়ে হ'লে ওদের খুব অসুবিধে হবে।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে সময় লাগল না, প্রবীর আরক্ত হ'ল, হাজার হোক বয়স এখনো তিরিশের নীচে, তাড়াতাড়ি বলল, 'না স্যার, অসুবিধে কিসের। মীরা চাকরি তো ছাড়বে না। আমরা এ-সব অনেকবার আলোচনা করেছি। ভাই-বোনদের দেখাশুনো পরেও করতে পারবে, না ?'

'পারবে বৈকি।'

'এবার স্যার আপনার মত বলুন।' প্রবীর সাগ্রহে ডাক্তারের মুখের দিকে চাইল, রায় শোনার আগে শেষবারের মত ওকালতি করতে ভুলল না। —'অবিশ্যি মোটে ম্যাট্রিক পাশ, দেখতেও খুব ভালো নয়। তা আমাদের ঘরে এই রকমই মানাবে, না স্যার ?'

ঠোঁটের কোনে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা দেখা দিল, ডাক্তার বললেন, 'মানাবে।' কিন্তু কণ্ঠস্বরে তাপ ফুটল না, আসন্নমৃত্যু রোগীকেও যে-ভাবে আশ্বাস দেন, 'ভয় কী, সেরে উঠবে' ঠিক সেই স্বরে বললেন, 'মানাবে।'

প্রবীর বিমূঢ়ের মত চুপ ক'রে রইল। গাড়ি ডিসপেনসারিতে পৌঁছে গেছে। ডাক্তার নেমেছেন। প্রবীর কতকটা যেন মরীয়া হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহ'লে পাকাপাকি সব ঠিক করি। আপনি আশীর্বাদ করছেন?'

যেন মাছি উড়িয়ে দিচ্ছেন, ডাক্তার এমন হাতের ভঙ্গি করলেন। 'ব্যস্ত কী। মেয়েটি সেরে তো উঠুক। তুমি বরং মিক্সচারটা তৈরি ক'রে পৌঁছে দিয়ে এসো। সেটা বেশি জরুরী।'

রোগীদের এখনো আসবার সময় হয়নি। কন্‌সল্‌টিং রুমে একটা চেয়ারে শরীরটা ঢেলে দিলেন ডাক্তার, কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে রইলেন। প্রবীর পাশের ঘরে। এখান থেকেই ডাক্তার শিশি গ্লাস ঠোকাঠুকির শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। আজ অবধি তাঁর তরুণ কম্পাউণ্ডারটি অনেক মিক্সচার তৈরি করেছে, কিন্তু এমন একাগ্র যত্ন নিয়ে বুঝি নয়। সব মমতা, সব উদ্বেগ একটি জীর্ণ বাড়ীর অন্ধকার ঘরের রোগিণীর জন্যে। শিশির দাগেও ওষুধের মাপ আছে, কিন্তু এই উৎকণ্ঠার নেই।

একবার ডাক্তার বিনা প্রয়োজনে কাশলেন। এখুনি ডাকবেন নাকি প্রবীরকে, তীব্র সত্যের ফুঁয়ে মধুর-মিথ্যাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবেন? একজন রোগী এসে ঢুকল, তার পিছনে আরেকজন, একে একে আরো অনেকে, ডাক্তার চিন্তার বৃত্তটাকে আর সম্পূর্ণ করবার সময় পেলেন না। তারপর ঘণ্টা দুই ধ'রে শুধু বুক-পিঠ-জিভ পরীক্ষা করা, খসখস কলমে প্রেস-ক্রুপশন রচনা। রুদ্ধশ্বাস সন্ধ্যা।

শেষ রোগীটি চ'লে যাবার পর ডাক্তার হয়ত কিছুক্ষণের জন্যে ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। ক্লান্ত, ক্লান্ত। ক্লান্ত স্নায়ু, ক্লান্ত পেশী। এ-ক্লান্তি শুধু শরীরের নয়, অন্তর্দ্বন্দ্বেরও।

—'স্যার, এবার চলি।'

ডাক্তার চোখ মেলে দেখলেন প্রবীর দাঁড়িয়ে। হাতে উজ্জ্বল লাল-রং মিক্সচারের শিশিটা।

'এদিককার সব কাজ শেষ হয়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ, তবে এসো।'

ডাক্তার আবার চোখ বুঁজলেন। তিনিও যেতে পারেন, কিন্তু রাস্তায় নামলেই তো আবার সেই লোকজন, গিশগিশ ভিড়। চড়া পাওয়ারের

আলোটা নিবিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার। একচক্ষু প্রহরীর মত এখন শুধু টেবল-ল্যাম্পটা চেয়ে আছে, কিন্তু ভাবনার সঙ্গে গোপন মিলনে সে বাধা হবেনা। এতক্ষণ এই ভাবনাটা পর্দার আড়ালে ছিল, কাজের ভিড়, বাইরের নানা লোক, সামনে আসতে ভরসা পায়নি, মাঝে মাঝে চুড়ি বাজিয়ে তাঁকে চঞ্চল করেছে। যেই সবাই চ'লে গেছে, অমনিই, ইশারাও করতে হয়নি, সে ছুটে চ'লে এসেছে সামনে, অসম্বৃত বেশবাসে, দীর্ঘ কেশপাশে তাঁর সবখানি ঢেকে দিয়েছে। এতক্ষণে ডাক্তার একা পেয়েছেন তাঁর ভাবনাকে, তাঁর ভাবনা তাঁকে।

কোথা থেকে মৃদু-মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে এল। চোখ মেলতে হ'লনা, ডাক্তার জানেন কিসের। রজনীগন্ধা। টাটকা ভিজে একগুচ্ছ ফুল, কোণের ছোট টেবিলটায় রাখা আছে। রোজ থাকে। ডাক্তারের নির্দেশ। আগে আগে প্রবীর কাগজের ফুল আনত। নির্গন্ধ, তারে বাঁধা তোড়া। একটায় অনেক দিন যেত। ডাক্তার একদিন ধমক দিয়েছেন প্রবীরকে। এগুলো কেন আনো। মিথ্যে, শুকনো, বাজে জিনিষ। ফুল যদি রাখতেই হয় তবে খাঁটি ফুল এনো। তার গন্ধ, পাপড়ি, প্রাণ, একদিনের জন্যেও সত্য। কাগজে তৈরী দীর্ঘ-মেয়াদী মিথ্যা নয়।

যা-কিছু মিথ্যা ডাক্তার সারা জীবন তাকে দূরে রেখেছেন, প্রয়োজন হ'লে তাকে নিবারণ করেছেন। নিপুণ-নিষ্ঠুর ছুরিতে অপারেশান টেবিলে রোগের মূল পিণ্ড দীর্ণ ক'রে যেমন বহুবার তাঁর ব্যবহারিক বিদ্যা সার্থক করেছেন, তেমনি অকল্যাণকে আঘাত ক'রে তাঁর ন্যায়-নীতি-সমাজবুদ্ধি শান্ত হয়েছে।

আজ বিকেলেও তিনি এমনই একটা মোহিনী মিথ্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তাকেও পিঁপড়ের মত ক'রে মারবেন, শুধু চিত্ত স্থির করতেই যা সময় লাগছে। প্রবীরের, তাঁর স্নেহভাজন সহকর্মীর, মনে আঘাত লাগবে, দ্বিধা শুধু এই জন্যেই। এও জানেন, নির্মম হ'তে হবে। আঁখিমোহকে প্রশ্রয় দিয়ে চির-দিনের মত প্রবীরের সর্বনাশ হ'তে দেবেন না।

কিছুদিন থেকেই প্রবীরের মুখে এই মেয়েটির খবর পাচ্ছিলেন। নতুন একটি কেমিক্যাল কোম্পানীর প্রতিনিধি, মেয়েটি কিছু ওষুধ নমুনা হিসেবে একদিন এসে গছিয়ে গিয়েছিল। সেই নমুনা ফুরিয়ে যেতে ফের এক দিন এসে আবার। শ্যামলা বাঙালী মেয়ে, এ লাইনে অনভিজ্ঞ। ওকে একটু উৎসাহ দেওয়াই তো উচিত, না স্যার? প্রবীর জিজ্ঞাসা করেছিল।

ডাক্তার বলেছিলেন, নিশ্চয়ই। মেয়েটিকে না দেখেই প্রবীরের করুণায় সায় দিয়েছিলেন।

করুণার চৌকাঠ পার হ'য়ে প্রবীরের অনুভূতি কবে যে প্রীতির ঘরে অভিসার শুরু করেছে, টের পাননি। প্রবীর তবু ধরা পড়ল। মেয়েটির উল্লেখে ওর গালে লালের ছোপ লাগে। হয়ত-বা কথা জড়িয়ে যায়। ঘন ঘন চোখের পাতা পড়ে। ডাক্তার একদিন ঠাট্টার সুরে বললেন, 'মেয়েটিকে আমি এক দিনও দেখতে পাইনা কেন বল তো। ওকি বেছে বেছে আমি যখন থাকিনা, তখনই আসে ?'

লজ্জা পেয়েছিল প্রবীর। তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'তা কেন, তা কেন। দুপুর বেলা আপনি তো থাকেন না, তাই।'

ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, 'ও।' কিন্তু কৌতুকটুকু চাপা দিতে পারেননি। 'তুমি তো আগে দুপুরে খেতে বাড়ি যেতে, আজকাল তাও তুমি যাওনা ? তোমার এই ক্ষুৎপিপাসাহরাটিকে একদিন সত্যিই দেখতে হচ্ছে।'

রহস্য করার মত সম্পর্ক নয়, মনিব এবং কর্মচারী। বয়সের ভেদও দুস্তর। প্রবীরের সঙ্কোচের অনেকটাই সেদিন ভেঙে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মীরাকে আপনি দেখবেন, স্যার ?'

'দেখব বইকি, নিশ্চই দেখব। তোমার পছন্দ-করা কনে, আমি একবার আশীর্বাদ ক'রে আসব না ?'

আজ তো গিয়েছিলেন দেখতে, কিন্তু আশীর্বাদ করতে পারলেন কই। গলির শেষে অন্ধকার ঘরে ময়লা বিছানায় শোয়া মেয়েটিকে দেখেই চমকে উঠেছেন, চিনতে দেরি হয়নি। তারপর নামমাত্র পরীক্ষা ক'রেই পালিয়ে এসেছেন, মোটরটাকে পুরো বেগে চালানোর আগে স্বস্তি পাননি।

পরীক্ষাটা অবশ্য ছল, ডাক্তার বুঝতে পেরেছেন। প্রবীর চেয়েছিল তিনি মীরাকে শুধু একটিবার দেখে আসুন। ওর পছন্দর কপালে অভিভাবক-স্থানীয়েব অনুমতির ফোঁটা পরাতে চায়। অসুখটা উপলক্ষ মাত্র।

আজ সকালে দোকানে এসে বসেছেন, প্রবীর প্রথম সুযোগেই প্রস্তাবটা পেশ করেছে।

—'ওর অসুখ, স্যার একবার দেখে আসবেন ?'

—'অসুখ, কী অসুখ ?'

অতো প্রবীর জানে না। মীরা তিন দিন এদিকে আসেনি। প্রতিবেশী কয়েকটা দোকান থেকে ওর হ'য়ে প্রবীর কয়েকটা অর্ডার সংগ্রহ করেছিল, তারা স্টকের জন্যে তাড়া দিচ্ছে। আজ প্রবীর মীরার অফিসে ফোন ক'রে জেনেছে তার অসুখ।

গিয়ে দেখলেন এমন কিছু নয়। স্যাঁতসেঁতে একতলা ঘরের বাসিন্দাদের এমন সর্দিজ্বর প্রায়ই হ'য়ে থাকে, আপনা থেকে সেরেও যায়। এ-জন্যে ডাক্তারকে কেউ ডাকে না। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন রোগটা উপলক্ষ।

সেই ঘরে ডাক্তার মাত্র মিনিট দুই ছিলেন। স্থির, অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন মেয়েটির দিকে। শয্যালীন, করুণ, রুগ্ন—দেহ নয়, দেহের ভঙ্গি মাত্র। চোখের পাতা ধ'রে টানলেন, হিম, শুভ্র, নীরক্ত। হাত ধরলেন, নাড়ী স্পন্দিত। ওরই মধ্যে ওঁর নিজের কব্জিতে মেয়েটির আঙুলের চাপ অনুভব করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে স'রে দাঁড়ালেন ডাক্তার। অন্ধকারে সাপের মণির মত দুটি চোখ জ্বলছে।

গম্ভীর গলায় ডাক্তার বললেন, 'প্রবীর চলো'। তারপর সোজা হেঁটে এসে মোটর। ধোঁয়া-ওড়ানো, ধুলো ছড়ানো স্টার্ট।

দরজার কবাট কেঁপে উঠল, বিরক্ত ডাক্তার চোখ মেললেন। এত রাতে আবার কোন রোগী এল। আপন ভাবনা নিয়ে সঙ্গোপন বাসরে বারবার এ কী উৎপাত। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, প্রায় ন'টা। আগন্তুকের দিকে না তাকিয়েই ডাক্তার বলতে যাচ্ছিলেন, 'এত রাত্রে কেস দেখব না', কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলেন। দরজার কবাটটা সম্পূর্ণ খুলে গেছে, চৌকাঠে পরিচিত একটি ছায়া।

ছায়া নম্র কণ্ঠে বলল, 'ওষুধ নিতে এসেছি।'

'ওষুধ ?' ডাক্তার যেন কিছু বোঝেন নি এমন ভাবে শব্দটা পুনরুচ্চারণ করলেন।

'আমি মীরা।'

'কিন্তু ওষুধ তো প্রবীর নিয়ে গেছে। পৌঁছে দেয়নি ?'

আঁচলের আড়াল থেকে ছোট একটা শিশি বেরুল।—'দিয়েছে, কিন্তু খেতে ভরসা হ'লনা, ডাক্তাবাবু। কে জানে ওষুধ, না বিষ।'

ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। ছায়ামূর্তি ততক্ষণে কায়ারূপ নিয়েছে। —'বিষ ? অতটা না ভাবলেও পারতে। প্রেসক্রপশনটা আমার বটে, ওষুধটা কিন্তু প্রবীর নিজ হাতেই তৈরী করেছিল মীরা।' ডাক্তার এক মুহূর্ত দম নিলেন, তারপর ধীরে অথচ জোর দিয়ে যোগ করলেন, 'কিন্তু তোমার নাম তো মীরা নয়।'

সাপের মণির মত চোখ দুটো একটু বুঝি নিষ্প্রভও হ'ল। ক্ষণেক মাত্র। মীরা বীমূঢ়তা কাটিয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, 'জানি, আপনি ভোলেন নি। অন্ধকার ঘরেও আপনার চোখ দেখেই বুঝেছিলাম। তাই তো শুয়ে থাকতে পারিনি। অসুস্থ শরীর নিয়েও একটা রিকৃশা ডেকে চ'লে এসেছি। একটা কথা জানতে চাই ডাক্তারবাবু। আপনি কি প্রবীরকে সব বলবেন ?'

একটুও সময় নিলেন না ডাক্তার, সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর-নির্বিকার গলায় বললেন, 'বলব।'

'বলবেন ?'

ডাক্তার আবার বললে, 'হ্যাঁ।'

ধক ক'রে মীরার চোখ জ্ব'লে উঠল ; বোঝা গেল দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন প্রয়াসে সে আত্মসংবরণ করছে। ঘৃণা-বিকৃত ব্যঙ্গ-বক্র কণ্ঠে বলল, 'আশ্চর্য মানুষ আপনি। একটা জীবন নষ্ট ক'রে দিতে আপনার বাধবে না ?'

'প্রবীরের জীবনটাও আমি নষ্ট হ'তে দিতে পারিনা, সেটা ভুলছ কেন ? তাকে আমি স্নেহ করি।'

'নষ্ট ?' মীরা সবিস্ময়ে বলল, 'নষ্ট হবে কেন। বরং গ'ড়ে উঠবে।'

ডাক্তার হেসে উঠলেন, 'মিথ্যার ভিত্তির উপরে ? আমি সত্যকে লুকোতে শিখিনি।'

'দম্ভ, দম্ভ। এই অন্ধ দম্ভেই একবার আমার জীবনকে আপনি নষ্ট করতে চেয়েছিলেন, মনে আছে ?'

—'যা কিছু খারাপ তাতো নষ্ট হওয়াই ভালো।'

'চেয়ে দেখুন, নষ্ট আমি হইনি। এখনও বেঁচে উঠতে পারি। আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু, দ্বিতীয়বার একই ভুল করবেন না।'

চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোমার আর কোন কথা না থাকলে তুমি যেতে পার অঞ্জলি।'

এবার টেব্‌ল ল্যাম্পটাও নিবিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার, নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে সেই ভাবনারা আবার এসেছে। সত্তাকে গ্রাস করছে ধীরে ধীরে। বাধা দিলেন না ডাক্তার, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে টেবিলে মাথা নুইয়ে দিলেন।

স্মৃতির সুড়ঙ্গ। হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে ডাক্তার এগিয়ে চলেছেন। শ্যাওলা, গর্ত, পিছল। অন্ধকার, গন্ধ। ডাক্তার অনেকদিন আগেকার একটি সন্ধ্যা খুঁজছেন। সেদিনও একটি মেয়ে এসেছিল। তখনও নিজের চেম্বার হয়নি, সকালে বিকেলে বসছেন হাসপাতালে।

পুলিশ অফিসার আগেই কথা ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। যথাসময়ে মেয়েটিকে নিয়ে এলেন, সঙ্গে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক, শুনলেন মেয়েটির কাকা। পুলিশ অফিসার আড়ালে ডেকে নিলেন, 'কেসটা পরশু উঠছে। রিপোর্ট কালই চাই কিন্তু।'

ডাক্তার আড়চোখে চেয়ে দেখলেন, নতমুখী মেয়েটি নখ খুঁটছে। বললেন, 'পাবেন।'

ইশারায় মেয়েটিকে ভিতরের ঘরে যেতে বললেন।

বাইরে কাকা আর অফিসারটির সামনে জড়োসড়ো হ'য়ে বসেছিল, ভিতরে এসে মেয়েটি সহজ হয়ে দাঁড়াল, অনম্র, অকুণ্ঠিত।—'বলুন, কী করতে হবে।'

'সামান্য একটু পরীক্ষা। আপনার বয়স কত আইন জানতে চায়।'

একটুখানি বিদ্যুৎ খেলে গেল মেয়েটির চোখে। 'প্রয়োজন নেই। আপনার কাছে খোলাখুলি স্বীকার করছি ডাক্তারবাবু, আমার বয়স এখনও আঠারো হয়নি।'

ডাক্তারবাবু চমৎকৃত হয়েছিলেন। কী বলবেন ঠিক করতে না পেরে কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'বেশ, তবে তো গোল চুকেই গেল। ছেলেটি আপনাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল একথা প্রমাণ করা সহজ হবে। নাবালিকা ফুসলানোর অভিযোগ—বাংলা কাগজে পড়েননি?'

স্পষ্ট মনে আছে, মেয়েটির মুখ পলকে সাদা হ'য়ে গেল। বলল, কিন্তু ও তো আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়নি। আমি নিজের ইচ্ছায় ওর সঙ্গে গিয়েছিলাম।

'নিজের ইচ্ছা, ভালোমন্দ বোঝবার বয়সই যে আপনার হয়নি।'

তিক্ত গলায় হেসে উঠল মেয়েটি। 'সে-কথা আইন বলে। কিন্তু মানুষ

হিসেবে আপনি কী বলেন ডাক্তারবাবু। দেখতে পাচ্ছেন না, অজিতকে আমি ভালবাসি, বিয়ে করতে চাই ?'

'আপনি ছেলেমানুষ।'

মেয়েটি যেন গর্জন ক'রে উঠল—'মিছে কথা। সব কিছু ভেবেই আমি ওর কাছে গিয়েছিলাম। সাত দিন হোটেলে, রেলে, স্টীমারে কাটিয়েছি, সব সময় ভয়, অশান্তি, তবু সে ক'টা দিন কী আনন্দে কেটেছে, আপনাকে বোঝাতে পারব না। কই, একবারও তো মনে হয়নি, ভুল করেছি, কিম্বা এ-সুখ আমার প্রাপ্য নয় ?'

নির্লজ্জতাও সুন্দর হ'তে পারে, ডাক্তার সেই প্রথম অনুভব ক'রে স্তম্ভিত হলেন। পুরোপুরি হ'তে তখনও একটু বাকী ছিল। তখনও জানতেন না, একটু পরেই মেয়েটির রূপান্তর ঘটবে, দৃঢ়মনা একটি কিশোরী একেবারে নরম হ'য়ে তাঁর পায়ের কাছে ব'সে পড়বে, আকুল হ'য়ে বলতে থাকবে, 'কুষ্ঠী-ঠিকুজি আর ডাক্তারি বিদ্যে যাই বলুক, আপনাকে একটা কাজ করতেই হবে, রিপোর্টে আমার বয়স বাড়িয়ে লিখতে হবে।'

—'মিথ্যে রিপোর্ট দেব!'

—'হোক মিথ্যে। আপনি ইচ্ছে করলেই আমাদের সুখী করতে পারেন, অজিতকে বাঁচাতে পারেন। নইলে অজিতের জেল হবে, জানেন ?'

অবিচল স্বরে ডাক্তার বলেছিলেন, 'অন্যায় করলে শাস্তি পেতেই হয়।'

হয়ত হতাশা, হয়ত ঘৃণা, হয়তো ভয় লুকোতে মেয়েটি দু'হাতে মুখ ঢেকেছিল। অতি ক্ষীণ গলায় বলেছিল, 'আপনাকে কথা দিচ্ছি ডাক্তারবাবু আমাদের বিয়ে হবে, বিয়ের পর আমরা দু'জন আপনাকে প্রণাম ক'রে যাব।'

কঠিন হ'য়ে ডাক্তার শুধু মাথা নেড়েছিলেন।

'দুটো জীবন ব্যর্থ ক'রে দেবেন ?'

'ব্যর্থতা আর সার্থকতা বিচারের ভার আপনার অভিভাবকদের উপর ছেড়ে দিলেই ভাল হয়না ?'

অস্থির হ'য়ে মেয়েটি বলেছিল, 'ডাক্তারবাবু, আপনি কী! সব কথা জানেন না, রায় দিয়ে ব'সে আছেন। জানেন আমার বাবার আয় মাস গেলে মোটে একশো কুড়ি টাকা? ভাইবোনে মিলে আমরা সাত জন? হাজার চেষ্টা করলেও বাবা আমার জন্যে এর চেয়ে ভালো সম্বন্ধ ঠিক করতে পারতেন ভেবেছেন? কক্ষনো না। বিশ্বাস করুন, বাবা নিজের ইচ্ছেয় কখনো

পুলিশে খবর দিতেন না, মামলাও করতেন না। আর পাঁচজনের পরামর্শে তিনি আমার সর্বনাশ করতে বসেছেন।'

ডাক্তার চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন, ঘড়িতে সময় দেখলেন। শান্তকণ্ঠে বললেন, 'এ-সব আলোচনা ক'রে বৃথা সময় নষ্ট করছেন।'

মেয়েটি স্থির চোখে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে সেও যেন নিস্তেজ হ'য়ে পড়ল। নীরেখ মুখে বলল, 'বেশ তবে পরীক্ষা করুন।'

সেই মেয়েটিই অঞ্জলি। তাকে ডাক্তার সেই ঘটনার পর আজই কিন্তু প্রথম দেখলেন না।

তিনি খাঁটি রিপোর্টই দিয়েছিলেন। একটি অপরিণামদর্শী কিশোরীর চোখের জলে টলেন নি। আদালতে হলপ ক'রে সত্য কথা ব'লে এসেছিলেন। পুলিশ অফিসারের মুখে পরে খবর পেয়েছিলেন ছেলেটির চার বছরের জেল হয়েছে। মেয়েটি ফিরে গেছে বাবা-মার কাছে।

স্বস্তি বোধ করেছিলেন। সামাজিক সুনীতি আর শৃঙ্খলা রক্ষায় নিজের সামান্য সহায়তার কথা স্মরণ ক'রে আত্মশ্লাঘাও। কিন্তু সেই মেয়েটির সঙ্গে এক বছর যেতে না যেতেই আরেকবার দেখা হবে ভাবেননি।

সে-দেখাটাও হয়েছিল অপ্রত্যাশিত স্থানে এবং কালে। তখন চেম্বার ছিল ধর্মতলা স্ট্রীট অঞ্চলে। ঐ পাড়ার এক সংবাহনাগারে 'রেইড্' হ'ল। পুলিশ পক্ষের সাক্ষী ছিলেন ডাক্তার। অফিসের এক কোণে কয়েকটি মেয়ে, মাথা নীচু, লজ্জায়, ভয়ে, মাটিতে মিশে যেতে চাইছে। একজনের দিকে চাইতে গিয়ে ডাক্তার চমকে উঠলেন। চিনতে দেরি হ'লনা। অফিসারকে বললেন, 'এই মেয়েটির সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

আড়ালে গিয়েই ডাক্তার বলেছিলেন, 'ছি-ছি-ছি, তোমাকে এখানে দেখব আশা করিনি।' সেবারে আপনি বলেছিলেন, এবারে অনায়াসে তুমিতে নেমে এলেন।

লজ্জায় যার মাটিতে মিশে যাবার কথা, সে মাথা তুলেছিল। সেই দৃপ্ত ভঙ্গিটিও পুরনো, ডাক্তারের চেনা।

'এর জন্যে দায়ী তো আপনি, ডাক্তারবাবু।'

হতচকিত ডাক্তার দু'পা পিছিয়ে গিয়েছিলেন।

'আমি।'

'আপনি। এমনিতেই আমার বিয়ের বরপণ জোগাড় করা বাবার পক্ষে সম্ভব হ'ত কিনা সন্দেহ। তারপর আদালত-ফেরত মেয়ের, বিশেষ, যে-মেয়ে সপ্তাহখানেক বিদেশে একজনের সঙ্গে হোটেলে কাটিয়ে এসেছে, তার কি সহজে পাত্র জোটে?'

ডাক্তার সায় দিলেন না, বাধাও না। চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন।

অঞ্জলি ব'লে গেল, 'অথচ আপনারা, আমার হিতাকাঙ্ক্ষীরা, সেদিন এই সহজ কথাটা একবারও ভাবেন নি। আপনি খসখস ক'রে রিপোর্ট লিখলেন, বাবা আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন, অজিতের জেল হ'ল। অথচ ওর বিরুদ্ধে কেসটা দাঁড়াতই না যদি আপনি রিপোর্টে শুধু—থাক, কী হ'লে কী হ'তে পারত সে-কথা আজ হিসেব ক'রে লাভ নেই।'

দীর্ঘ স্তব্ধতা ভেঙে ডাক্তার বলেছিলেন, 'তাই ব'লে তুমি এত নিচে নেমে আসবে—'

বাধা দিয়ে অঞ্জলি বলল, 'আপনি শেষের ধাপটাই শুধু দেখেছেন, মাঝের গুলো দেখেন নি। তাঁর যে ইস্কুলের কেরাণীগিরির চাকরিটা কোনদিন যেতে পারে আরও অনেক কিছুর মত বাবা এটাই কি হিসেবের মধ্যে ধরেছিলেন? ভাইবোন মিলিয়ে আমরা সাতজন—বাকিটা অনুমান ক'রে নিন।'

'আর সেই ছেলেটি?' এত সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছেন ডাক্তার যে নিজের প্রশ্নটা নিজেই স্পষ্ট শুনতে পাননি।

'অজিতের কথা জিজ্ঞেস করছেন? সম্ভবত সে এখনও জেলে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দাগী আসামী, ছাড়া পেলেও সে পুরনো চাকরিটা আর ফিরে পাবে না। তাকে যদি কোনদিন রাস্তার ভিড়ে কারুর পকেট মারতে দেখেন ডাক্তাবাবু, সেদিনও কি আপনি এমনিই অবাক হবেন, আমাকে আজ এখানে দেখে যেমন হয়েছেন?'

'তুমি কিন্তু ভদ্র কোন জীবিকা নিতে পারতে।'

অঞ্জলি হেসে উঠল। 'সামান্য লেখাপড়াজানা মেয়ের ভদ্রভাবে বেঁচে থাকবার ক'টা রাস্তা খোলা আছে ডাক্তারবাবু?'

স্মৃতির সুড়ঙ্গপথে ডাক্তার অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। রুদ্ধশ্বাস, নিরালোক পথ, দু'দিকেই ঠোকর খেতে হয়, ভাবেন পিছিয়ে আসবেন, পারেন না, ইচ্ছায়-

অনিচ্ছায় অগ্রসর হ'তেই হয়। এখন কত রাত কে জানে। রাস্তায় ব্যস্ততা থিতিয়ে এসেছে। ক্বচিৎ একটি রিক্সা, কোথাও একটি-বা সওয়ারী-সন্ধানী ট্যাক্সি।

সেই ধাক্কা ভুলতে সময় লেগেছিল। 'আপনিই দায়ী'—কথাটা অনেক-ক্ষণ ধরে বেজেছিল কানে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বিমর্ষভাবটাও স্থায়ী হয়নি। সত্যের প্রয়োজনে দু'চারটা অপ্রিয় কর্তব্য ডাক্তারকে করতেই হয়, বিষফল দেখে ভয়ে পিছিয়ে এলে চলবে কেন।

ডাক্তার মনে মনে হিসেব ক'রে দেখলেন, উচিত বিবেচনায় কঠোর কাজ জীবনে তিনি আরও কত করেছেন ইয়ত্তা নেই। এই তো কিছুদিন আগে ইন্‌সিওরেন্সের এক দালাল একটি লোক ধ'রে এনেছিল। পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার দেখলেন লোকটার দেহে অপুষ্টিকর লক্ষণ স্পষ্ট। যে-কান শক্ত অসুখে পড়া বিচিত্র নয়। সার্টিফিকেট দেননি। দালালকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। যাবার সময় সে অসন্তুষ্ট হ'য়ে ব'লে গেছে 'ভালো করলেন না, আপনার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। অন্য যে-কোন ডাক্তারকে দিয়ে হেল্‌থ সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিতে পারি—জানেন ?' ক্রুদ্ধ-কুপিত ডাক্তার শুধু কোনমতে তাকে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

সেই দালালটির চক্ষুলজ্জা সম্ভবত কম, কয়েক মাস পরে নিজে এসে বলেছিল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন ডাক্তারবাবু, লোকটার টি, বি হ'য়েছিল।'

—'সেরে গেছে ?'

—উঁহু' দালাল হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল, 'মারা গেছে। কোম্পানীর আপনি পাঁচ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ওর ছেলেকে দেখলুম, মার হাত ধ'রে ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করছে।'

দালাল লঘুকণ্ঠে গল্পটা বলেছিল, কিন্তু ডাক্তার সে জন্যে আঘাত কম পাননি। ওর কেস মেনে নিতে সুপারিশ করলে কোম্পানীর বিশেষ লোকসান হতনা, কিন্তু একটি পরিবার ভিখারী হবার হাত থেকে নিস্তার পেত, এ-কথাও একবার মনে হয়েছে।

আর মনে পড়ছে পাড়ার মুদী সর্বেশ্বরের কথা। অষ্টম সন্তানের পিতৃত্বের সম্ভাবনায় ভয় পেয়ে রেহাই পাবার কোন পথ আছে কিনা চুপে চুপে জানতে এসেছিল। ডাক্তর গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'এ-সব নোংরা কাজ আমি করিনে। এ বে-আইনী।'

বে-আইনী ? মাথা চুলকে, অপ্রতিভ, ভদ্র নাগরিক সর্বেশ্বর স'রে পড়েছিল। অষ্টম গর্ভের সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে, এ-খবরও ডাক্তার পেয়েছিলেন। বহুদিন পরে সর্বেশ্বরের সঙ্গে দেখা হ'তে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ওহে তোমার বৌ কেমন আছে ?'

'আজ্ঞে, ভালো।'

'বাচ্চাটা ?'

'সে তো নেই।' বোকার মত সর্বেশ্বর শুধু হেসেছিল, 'তিনমাসের মাথাতেই গেল। ওর মার স্থতিকার ব্যামো, ডাক্তার বিলিতি ফুড খাওয়াতে বললেন, তা দিনকাল বাজার যা পড়েছে, নিজেদের ফ্যানই জোটেনা, তো বিলিতি ফুড। ট্যাঁ ট্যাঁ ক'রে ক'দিন বাচ্চাটা কাঁদল, শেষে যখন দেখলে কেঁদে কোন ফল হবে না, তখন স'রে পড়ল। ভালই হ'ল, কী বলেন ? এটা বোধ হয় বে-আইনী হয়নি, না ? একে নিশ্চয় ভ্রূণহত্যার অপরাধ বলে না ?'

সর্বেশ্বর আগের মত হাসছিল, ডাক্তার পারেননি। মনে হয়েছিল সর্বেশ্বরের হাসির সবটাই বুঝি বোকামি নয়।

ডিসেপেনসারির ঘরটা পুবমুখী, সামনের বাড়ীটাব ছাতের ছাড়পত্র পেয়েই দিনের প্রথম রোদটুকু কোনাকুনি এসে টেবিলের উপর গড়িয়ে পড়ে। ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন ডাক্তার, কী আশ্চর্য, সকাল হ'য়ে গেছে ? কাল সারাটা রাতই তবে কি ডিসপেনসারিতে ঘুমিয়ে কাটালেন। ঘুম তো নয়, আধো-তন্দ্রা আর আধো-জাগরণের স্রোতে সাঁতার। কখনো ডুব দেওয়া, কখনো ভেসে ওঠা। ঘামে শার্টটার বুক অবধি ভিজে গেছে, চোখের অতৃপ্ত পাতায় কেমন একটা জ্বালা। এতদিন ধ'রে প্র্যাকটিস করছেন কিন্তু এমন কোনদিন হয়নি। আর কোনদিন গোটা রাতটাই ডিসপেনসারিতে কাটিয়েছেন ব'লে মনে পড়ে না।

চোখে-মুখে জল দিলেন ডাক্তার, এই ঘরটিতে কণ্টকিত একটা অস্বস্তি। এখান থেকে পালাতে হবে।

কাল রাতে ওরা সকলে এসেছিল। অঞ্জলি চ'লে যাবার পর। শুধু সর্বেশ্বর দালাল নয়, আরো অনেকে। রতিজ ব্যধির জন্যে বাড়ির ঝি শিবানীকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে পায়ে ধ'রে কেঁদেছিল, ডাক্তার ক্ষমা করেন নি। সেই মেয়েটি তাঁরই বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।

এমনি আরো অনেক নাম, অনেকগুলো মুখ। মিছিলের মত তারা একে একে এসে আচ্ছন্ন চেতনার জানালার সমূখে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের চোখে আগুন, তর্জনীতে অভিযোগ। তুমি দায়ী, তুমি, তুমি। ডাক্তার শিউরে উঠেছেন, দরদর ঘাম, আতঙ্ক, ভেবেছেন জানালাটা বন্ধ ক'রে দেবেন, কিন্তু কী আশ্চর্য, চেতনার জানালায় আজ পাল্লা নেই। অসহায়ের মত ডাক্তার বুকের ওপর দু-হাত জড়ো ক'রে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছেন।

তুমি দায়ী, তুমি। এ তো অঞ্জলির গলা, এ-মুখ তো অঞ্জলির। ঝুঁকে প'ড়ে ভালো ক'রে দেখতে যেতেই সে-মুখ মিলিয়ে গেছে, এসেছে শিবানী। আমাকে হত্যা করেছ—তুমি। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক্তার বুঝি বলতে গেছেন, 'কিন্তু শিবানী তুমি তো নিজেই'—সে-কথা শিবানী শোনেনি, প্রবল বেগে মাথা নেড়ে স'রে গেছে। এবার একটি রুগ্ন শীর্ণ ছেলে তার মার হাত ধ'রে এসেছে, তাঁর দিকে আঙুল তুলে বলেছে, তুমি আমাদের ভিখারী করেছ।

আমি? জবাব দেবার অবসর মেলেনি, আরো নতুন মুখ এসেছে, কেউ আহত, কেউ অভিমানী, কেউ অসুখী। বহু বিকলাঙ্গ জীবন আর অকাল মৃত্যু তাঁকে ধিক্কার দিয়ে গেছে।

বাইরে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার, এক ঝলক সকালের স্নিগ্ধ হাওয়ায় সর্বাঙ্গে কাঁটা দিল; স্টীয়ারিং ধ'রে যখন বসলেন তখনও হাত কাঁপছে। কালকের ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি, এখনও উইণ্ডস্ক্রীনের ঝাপসা কাচে ছায়াছবির মত সেই মুখগুলোকেই যেন আরেকবার দেখছেন। শুধু ব্যর্থতা আর বিকৃতি, পথের দু'ধার শবে-কঙ্কালে পরিকীর্ণ। এ কি তাঁরই কীর্তি; থরথর ক'রে কেঁপে উঠলেন ডাক্তার, এ-তো তিনি চাননি। সারা জীবন ধ'রে সত্য আর নীতির পায়ে ফুল দিলেন, তার ফল কি এই? কৃতকর্মের ঝুলি শুধু একটির পর একটি অ-সুখের নুড়ি কুড়িয়েই ভ'রে তুলেছেন, আনন্দের স্পর্শমণির একটী কণিকাও কি জোটেনি? করতল সিক্ত, গভীর অবসাদে, অপরাধবোধে দেহটা ভারি; সেই ভাবটা কাটিয়ে উঠতেই ডাক্তার যেন গাড়ির গতি হঠাৎ বাড়িয়ে দিলেন।

সেই বন্ধ গলি, কচ্ছপের মত গলা বাড়িয়ে যে ভীরু কুৎকুতে চোখে সদর রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। গলির শেষে জীর্ণ একতলা বাড়ি, যার কলিজায়-অন্ত্রে-ফুসফুসে অন্ধকার। ডাক্তার যখন জোরে জোরে কড়া ধ'রে নাড়তে শুরু করলেন তখনও বেলা হয়নি, রকে একটা রাত-কুকুর নিশ্চিন্ত নিদ্রামগ্ন।

'কে।' ভিতর থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করল। ভাঙা গলায় ডাক্তার শুধু বলতে পারলেন, 'আমি।'

দরজা খুলেছে অঞ্জলিই, বিছানা-বাসি শাড়িটা এখনও অবিন্যস্ত। ডাক্তারকে দেখে অবাক হ'য়ে গেছে। নিজের অবিন্যস্ত বেশবাসের কথা খেয়াল নেই; নির্নিমেষ চোখে দেখছে শুকনো ঘামের হলদে ছোপ-লাগা শার্টের বুক, এলোমেলো চুল, বিহ্বল, অনিদ্রাবিল দৃষ্টি। বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতে মাথা নিচু করল, বলল, 'ভিতরে আসুন।'

তাড়াতাড়ি মুখস্ত-পড়া গলায় ডাক্তার ব'লে গেলেন, 'বসব না। তোমাকে শুধু একটা কথা বলতে এলাম।'

উদ্‌ভ্রান্ত, কিন্তু স্থির, দু'টি চোখের দিকে আবার তাকাতে গিয়ে অঞ্জলির পায়ের নখাগ্র অবধি যেন শিউরে উঠল, আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'বলুন।'

মমতা-গাঢ় মসৃণ গলায় ডাক্তার ধীরে ধীরে বললেন, 'কাল তুমি চ'লে আসবার পর থেকে সারারাত ধ'রে শুধু ভেবেছি অঞ্জলি।—ভেবে ভেবে ঠিক করেছি—দ্বিতীয়বার একটা ভুল করব না।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না', অঞ্জলি কাঁপা গলায় বলল।

কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে নিলেন ডাক্তার, নত হ'য়ে, অঞ্জলির প্রায় কানে কানে বললেন 'যা জানি তার একটি কথাও প্রবীর জানতে পাবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। অতীত অতীতই থাকবে। তোমরা সুখী হও।'

শেষের কথাটা আশীর্বাদের মত শোনাল। এক মুহূর্তের জন্যে ডাক্তার নিজেও বুঝি বিহ্বল হয়েছিলেন। হঠাৎ দেখলেন গলায় আঁচল জড়িয়ে নিয়েছে অঞ্জলি, তাঁকে প্রণাম করছে। শুনতে পেলেন অস্ফুট কণ্ঠে বলছে, 'জানতাম, আপনি বলবেন না।'

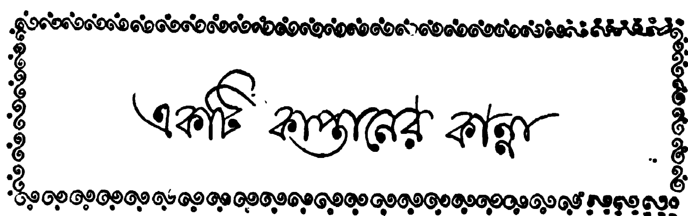
সম্মোহিতের মত একখানি হাত বাড়িয়ে দিলেন ডাক্তার, প্রণতার মাথায় রাখলেন। অঞ্জলি মুখ তুলল। ডাক্তার দেখলেন, প্রশান্ত, কৃতজ্ঞ, বড়ো বড়ো দু'টি চোখ। রোমাঞ্চিত ডাক্তার জীবনে এই প্রথম অনুভব করলেন সুনীতির চেয়ে সুখ বড়ো; শান্তি ঢের বড়ো সত্যের চেয়ে।



প্রিয় অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল। ঘড়িতে ঢং-ঢং করে ন'টা বাজতে তাকে আর ঠেকান গেল না, হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে ফরাশ ছেড়ে উঠে পড়ল। ভীত চোখে রাস্তার দিকে একবার চেয়ে বললে, 'অনেক রাত হল। আমি এবার যাই। সতীনাথ, টাকাটা এবার দিয়ে দেও?'

উত্তরে সতীনাথ সুপ্রিয়র জামার আস্তিনটা চেপে ধরল।—'এত তাড়াতাড়ি? এখনও যে সন্ধ্যেই হয়নি। আরে, ব'স ব'স।

হাতটা ছাড়িয়ে নিতে ব্যর্থ চেষ্টা করে সুপ্রিয়, ফের ফরাশে বসে পড়ল। বেশ টানাটানি করলে আস্তিনটা ছিঁড়ে যাবার ভয় আছে। অটুট জামা বেশি নেই, ধোপদুরস্ত একটিও না। এইটি পরেই কাল কলেজে বেরুতে হবে।



খুশী হয়ে সতীনাথ বললে, 'এই তো গুড বয়। তবে কেন দর বাড়াচ্ছিলে?'

মুখ কাঁচু-মাচু করে সুপ্রিয় বললে, 'অরুণা বসে থাকবে। বকবে। ছেলেটার অসুখ দেখে এসেছিলাম, ওর জন্যে ওষুধ নিয়ে যাব বলে বেরিয়েছিলাম।'

'বসে থাকবে! বকবে!' মুখ ভেঙচে সতীনাথ বলে উঠল, 'ব্রাদার, আমাদেরও নেহাত বিধবা ভেব না। আমাদেরও ঘরে বৌ আছে। ফিরতে দেরি হলে কেঁদে কেটে অনর্থ করে। করে না মাস্টার?'

মাস্টার-সম্বোধিত নিবারণের চোখ ঢুলু-ঢুলু হয়ে এসেছিল, হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আলবত করে।'

সময় পেয়ে সতীনাথ উৎসাহিত হল। আর একজন সঙ্গীর দিকে চেয়ে বললে, 'এই তো প্রফুল্লর বৌ সেবার রাগ করে বাপের বাড়ি গিয়েছিল, পুরোপুরি দু' মাস ফেরেনি। তাই বলে প্রফুল্ল কি ভয় পেয়েছে, না ঘাবড়ে গেছে? না কি বৌকে ফিরিয়ে আনতে পায়ে ধরে সাধতে গেছে? বল না হে প্রফুল্ল?'

প্রফুল্ল মাথা নেড়ে গর্জন করে উঠল, 'নেভার'।

খুশী হয়ে সতীনাথ বললে, 'এই তো পুরুষসিংহ!

ব্রাদার, তোমাকেও সিংহ হতে হবে। ভিজে বেড়ালটি থাকলে চলবে না।'

ও-পাশ থেকে কে সংশোধন করে দিলে, 'বেড়াল নয়, মেষ। কবি বলেছেন, মানুষ আমরা, নহি তো মেষ'

সপ্রশংস চোখে তার দিকে তাকিয়ে সতীনাথ বললে, 'দেখলে, আমাদের শিবেন আবার কবিতা কোট্ করে। বুঝলে সুপ্রিয় তুমি কলেজে মাস্টারি কর আর যাই কর, শিবেনের মত স্কলার হতে পারনি।'

বিনা প্রতিবাদে সুপ্রিয় কথাটা মেনে নিলে। দ্রুত হাতে তাস বাঁটা হতে থাকল। সে-তাস কেউ ছুঁলো না, তবু ঝন ঝন পয়সা পড়তে থাকল ফরাশে। মোটা হাতে একটা দান জিতে সতীনাথ খুচরো পয়সা কোলের দিকে টানছিলো। সুপ্রিয় ভয়ে ভয়ে বললে, 'এবার যদি আমাকে টাকা দিয়ে দাও সতীনাথ, আমি বাড়ি যাই। ওষুধ কিনতে হবে, এর পর ডাক্তারখানা হয়তো খেলা পাব না।'

'পাবে হে পাবে। তোমাকে গাড়ি করে ডে এ্যাণ্ড নাইট সার্ভিস স্টোর্স থেকে দবাই কিনে দেব। আর দু'টো দান মারতে দাও। দেখছ, সবে জেতার হাত আসছে। আর দশ মিনিট বাদে এই থেকেই তোমাকে টাকাটা দিয়ে দিত পারব! ব্রাদার, আজ রেসে পাঁচশো গেছে, তাসে-যদি অন্তত পঞ্চাশ না তুলি তবে ললিতা আমাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। তুমিও বসে যাও না বাবা, ধার নেবে কেন, নিজেই দরকারী টাকাটা জিতে নিয়ে বাড়ি ফের।'

সুপ্রিয় তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না না। এ-সব আমার আসে না। সঙ্গে টাকা নেই। তা-ছাড়া অরুণা একটু অন্য রকমের জানই ত। এ-সব পছন্দ করে না।'

পলকে সতীনাথের মুখে ভাবান্তর ঘটে গেল। হাতের তাসগুলো চিত করে ছড়িয়ে দিল ফরাশে। কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'অর্থাৎ বলতে চাস দুনিয়ায় একমাত্র তোব বৌ সতী—আর সব অন্য রকম? এই আমি ইস্কাফনের টেক্কা ছুঁয়ে বলছি, বাবা আমার নাম রেখেছিলেন সতীনাথ, আমার বৌ হানড্রেড পারসেন্ট সতী। ওর গায়ে সুদর্শন চক্র ছোঁয়ালে যেখানে-যেখানে অঙ্গ পড়বে, সেখানেই জাগ্রত তীর্থ হবে জানিস?'

বয়স্যরা সালিশী করতে এগিয়ে এল। বললে, 'যেতে দাও, সতীনাথ, যেতে দাও! দেখছ না, মুর্গীতে ঠোকরানো স্বামী। বৌয়ের ভয়ে জুজু হয়ে থাকে, ফূর্তির ফোটাটুকুও নেই, রস নেই, ওর জীবনটাই মিজারেবল।'

নৃত্যগোবিন্দ বললে, 'আমার বাবা ও-সব ঝামেলা নেই। সফ্রেজেট্‌দের খাতায় নাম লিখিয়ে কবে ফ্রী বার্ড, আজাদী চিড়িয়া হয়েছি। বৌয়ের আঁচলে বাঁধা আধুলিটি হয়ে থাকিনি বাবা! প্রফুল্ল, তুই তো যেদিন ফিরতে দেরি হবার কথা, সেদিন ঘড়িটা দু' ঘণ্টা স্লো করে দিয়ে আসিস, না?'

ভাল মানুষের মত গলায় প্রফুল্ল বললে, 'আগে আসতুম, এখন তাতেও কুলোচ্ছে না। ধরে ফেলেছে। আজ-কাল করি কী, টাইমপীসটায় দমই দিইনে, ঠিক হিসেব করে, যাতে ওটা রাত দশটা-এগারটা নাগাদ বন্ধ হয়ে থাকে।'

রেস্তোরাঁয় আগেই ফরমাশ গিয়েছিল। ট্রে-তে সাজিয়ে বয় মাংস রেখে গেল। সুস্বাদু পাখীর মাংস, তখনও ধোঁয়া উড়ছে।

মাংস দেখেই সতীনাথের রাগ পড়ে গিয়েছিল, এক হাতে সুপ্রিয়র গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'মাথা খাস সুপ্রিয়! একটু মাংস চেখে যা তারপর ডাক্তারখানা থেকে না হয় একটা মলম কিনে নিয়ে যাস, বৌ মারধোর করলে মালিশ করিস।'

তুমুল একটা সমবেত গলার হাসিতে দরজার পর্দা কেঁপে উঠল, কাশতে কাশতে কেউ কেউ গড়িয়ে পড়ল ফরাশে। ঠিক তখুনি চৌকাঠে শাড়ি-ঘেরা দু'টি পা দেখা গেল, হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে সতীনাথ সেই পা দুটিই জড়িয়ে ধরল। 'এই যে সুহাস, এসেছ? মাইরি, বাঁচালে। আমাদের ফূর্তিটা আর একটু হলেই মারা যেতে বসেছিল আর কী! এই যে আমার বন্ধুটিকে দেখছ, ইনি একজন অতীব নিরীহ অধ্যাপক—পূরো বারো বচ্ছর মাস্টারি করেননি, কিন্তু এরই মধ্যে গাধা বনে গেছেন। একে পিটিয়ে তোমাকে একটু ঘোড়া করতে হবে, পারবে না?'

সুহাস মুখ টিপে হাসল।—'একেবারে ঘোড়া? আজ বুঝি মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেছে সতীবাবু?' কপটকোপ ভ্রূভঙ্গি করে বলল, 'আপনারা কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন। আমি ঘরে নেই, সন্ধ্যেবেলা স্টুডিওতে গেছলুম, সেই ফাঁকে ঘরে ঢুকে আসর জমিয়ে তুলেছেন? জানেন, পুলিশ ডেকে আপনাদের ধরিয়ে দিতে পারি?'

ফরাশের ওপর চিত হয়ে কাৎরাতে কাৎরাতে সতীনাথ বললে, 'আর ব্যথা দিও না। আজ ঘোড়-দৌড়ে পাঁচশো টাকা গেছে, সেই শোক ভুলতে দৌড়ে-ছুটে এসেছি। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা সইবে না। বিষ খেয়ে মরব, মাইরি বলছি।'

সুপ্রিয় কাঠ হয়ে দেখল সব।

ঝির-ঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, ওরা টের পায়নি। হঠাৎ ঘরে ঠাণ্ডা এক ঝলক হাওয়া ঢুকে তাস এলোমেলো করে দিতেই সবাই সমস্বরে হর্ষধ্বনি করে উঠল। সতীনাথ বললে, 'হুরে! সুহাস এমন চমৎকার ওয়েদার আজ, শুধু তাসে তো জমবে না?'

সুহাস ইতিমধ্যে হাত-মুখ ধুয়ে ফরাশের প্রান্তে এসে বসেছিল। কখন আলগোছে খোঁপাটা খুলে ফেলেছে, ওরা দেখেনি, এখন দীর্ঘ কালো বিনুনিটা বুকের সামনে টেনে নিপুণ মেয়ে-সাপুড়ের মত অলস আঙুলে খেলা করছে। সতীনাথের প্রস্তাবে সুহাস শুধু মুচকে হাসল, 'আজ ও-সব না। বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলতে এসেছেন, আর ঘণ্টাখানেক খেলে ফিরে যান। বেশি হল্লা করলে পুলিশ আসবে।'

সতীনাথ কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, 'কেন মিছিমিছি ধোঁকা দিচ্ছ সুহাস! তুমি হলে গিয়ে পুলিশের ঘরের পিসি, তা কি আমরা জানিনে? সজ্জন রসিকেরা তোমার ঘরে এসেছেন, তাদের একটু রস নিবেদন করবে বই তো নয়।'

সুপ্রিয় সুহাসকে উঠে বাড়ির ভিতর যেতে দেখল, ফিস-ফিস করে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কী যেন বললে চাকরকে; একটু পরেই চাকরটা সারিসারি সোডার বোতল ঘরের কোণে সাজিয়ে রেখে গেল। আরেক বার ওরা সমস্বরে বললে 'হু রে', তাসগুলো মাথার ওপর তুলে বাতাসার মত হরিরলুট দিলে।

সুপ্রিয় বললে, 'সতীনাথ, অন্তত এবার আমাকে ছেড়ে দাও।'

সতীনাথ বললে, 'দেব, দেব। দেখছ না বৃষ্টি পড়ছে? মাটি ভিজছে, ছাত ভিজছে, গাড়ি ভিজছে, তুনিয়ার সব কিছু ভিজছে, আর আমাদের গলা ভিজবে না?'

সতীনাথের চোখের ইঙ্গিতে স্থহাস স্থপ্রিয়র কাছে ঘেঁষে বসল, সাপের মত বিন্থনির লেজে হাত বুলোতে বুলোতে মৃত্থ গলায় বললে, 'একটু খান, স্থপ্রিয়বাবু।'

সম্মোহিতের মত স্থপ্রিয় সফেন গ্লাসটা তুলে নিল, এক চুমুক খেয়েই জিভ্ তেতো হয়ে গেল, গলা জলে উঠল, তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখল পানাধার, তখনও হাত থর-থর করে কাঁপছে।

ওর পিঠে হাত রেখে সতীনাথ বললে, 'খারাপ লাগছে? ভয় করছে? প্রথম দিন আমারও লেগেছিল। ভয় করেছিল।' গদগদ গলায় মন্তব্য করলে, 'ভয়কে জয় করতে হবে ভাই, নইলে কিসের মানুষ, কিসের পুরুষ। ভায়া হে, আজ তোমাকে ঠাট্টা করছি, কিন্তু একদিন আমিও মণিকাকে—আমার বৌকে ভয় করতুম। প্রথম যেদিন ও টের পেলে, সেদিন ও আমার বুকে মুখ গুঁজে এত কেঁদেছিল যে সাত সাতটি দিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগেছিলুম। আর একটু হলে নিউমোনিয়া ধরত।'

সোডার ছিপির মত এক টুকরো হাসি ছিটকে পড়ল ঘরে, বিন্থনিটা তুলে স্থহাস চাবুকের মত সপাং করে মারল সতীনাথের গালে, আর বিব্রত, কিন্তু পুলকিত সতীনাথ সেই জায়গাটাতে হাত বুলোতে থাকল—'তুমি বিশ্বাস করছ না স্থহাস, আমার বৌ কাঁদে। রাগ করে। এই তো আজ বিকেলে বাপের বাড়ি যাবে বলে বায়না ধরেছিল। বলেছিল রেস-কোর্স থেকে গাড়িটা যেন সোজা ফিরিয়ে নিয়ে যাই। আমি বাবা সোজা এখানে চলে এসেছি। ফিরে গিয়ে হয়ত দেখব খায়নি, মুখ গোমড়া করে বসে আছে। স্থপ্রিয়র কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সতীনাথ বললে, 'স্থপ্রিয়, তোমাকে সাহসী হতে হবে।'

প্রত্যুত্তরে স্থপ্রিয় মাটিতে নামিয়ে রাখা গ্লাসটা আবার তুলে নিল।

স্থপ্রিয় অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করেছে, জানালার শিকের ফাঁকে একটি বেড়ালের করুণ-উজ্জ্বল তু'টি চোখ। আহা, বৃষ্টিতে ভিজে কাবু হয়েছে অথচ ঘরে আসতে সাহস নেই। মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে দেখল ঘরের সব ইয়ারদের চোখও বিস্ফারিত, চকচকে,—ঠিক বেড়ালটার মত। তবু তো ওরা জলে

ভেজেনি, শুধু গলা ভিজিয়েছে। তুড়ি দিয়ে সুপ্রিয় বেড়ালটাকে কাছে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে বেড়ালটা পড়ল ঘরের মেঝেয়, এদিক-ওদিক সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে সুহাসের ঠিক কোল ঘেঁষে বসে পড়ল। ভিজে রোঁয়াগুলো পিঠের সঙ্গে লেগে গেছে, সুহাস ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল, উৎকণ্ঠিত গলায় বললে, 'মিনি, এতক্ষণ কোথায় ছিলি ?' মিনি ক্ষীণ গলায় বললে, মিঁউ।

শ্রোতাদের দিকে চেয়ে সুহাস বললে, 'আমার পোষা বেড়াল। আমার হাতে ছাড়া দুধ খায় না, আমার পাশটিতে ছাড়া শোয় না। খুব শান্ত। ওকে কিন্তু ট্রেনিং দিয়েছি আমি। প্রথম প্রথম নোংরা ছিল। নেংটি ইঁদুর আর ছুঁচো ধরে ধরে খেত। এক দিন একটা ইঁদুর মুখে নিয়ে আমার বিছনায় উঠেছিল। আমি কী করেছিলুম, বলুন তো।'

ঢুলু-ঢুলু চোখে সতীনাথ বললে, 'শাস্তি দিয়েছিলে।'

মাথা নেড়ে নেড়ে সুহাস বললে, 'হল না, সতীবাবু, বলতে পারলে না। আমি ওকে কোন শাস্তি দিইনি। শুধু বিছানা থেকে নামিয়ে দিয়েছিলুম। পর পর তিন দিন ওর সঙ্গে একটিও কথা বলিনি, ওকে আদর করিনি। মিঁউ-মিঁউ করে কেঁদে কেঁদে গেছে। ওরা পশু হলে কী হয়, ভালবাসাটা ঠিক বোঝে সতীবাবু।'

সুহাস আবার সুপ্রিয়র গ্লাস ভরে দিতে যাচ্ছিল, সুপ্রিয় সভয়ে বলে উঠল, 'আর না; আর না।' তখনও কিছু চেতনা গ্লাসের তলানির মত অবশিষ্ট ছিল, শেষবারের মত হাত জোড় করে বললে, 'কিন্তু সতীনাথ তুমি এখনও উঠবে না ?'

সতীনাথ বললে, 'উঠব, উঠব।'

উঠব বলেও সতীনাথ উঠল না, একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আরও আরাম করে বসল, সুহাসকে ইঙ্গিত করলে ওর গ্লাস ফের ভরে দিতে। টিক টিক করে সময় এগিয়ে গেল, বাইরে ঝর-ঝর বৃষ্টি আর ফ্যানের হাওয়ায় বেড়ালটার ভিজে রোঁয়াগুলো শুকিয়ে ফর-ফর করে উড়তে থাকল।

সুপ্রিয়র চোখ দু'টিও ঢুলু-ঢুলু হয়ে এসেছিল, কখন একটু ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে। হঠাৎ জেগে উঠে দেখল, সমস্ত ঘর চুপ, ওর হাতঘড়িটাও যেন চুপ। মাংসের ঝোল আর পানীয়ের তলানিতে ফরাস ভেসে গেছে, সেখানে শ্রান্ত, নিদ্রাতুর কয়েকটি ইয়ার গড়াগড়ি দিচ্ছে। সতীনাথের কোলে মাথা রেখে সুহাসও ঘুমিয়ে।

কত রাত কে জানে। ব্যস্ত হয়ে স্থপ্রিয় সতীনাথকে ঠেলতে থাকল—'এই সতীনাথ, ওঠ, ওঠ, বাড়ি যাবে না ?'

চোখ কচলাতে কচলাতে সতীনাথ উঠে বসল, স্থহাসের মাথাটা পড়ল মাটিতে, কিন্তু ওর ঘুম ভাঙল না। আরক্তিম চোখ দুটি বিস্ফারিত করে সতীনাথ বললে, 'ক'টা বেজেছে ?' বলে নিজেই হাতঘড়িটা কানের কাছে ধরল। মূঢ়ের মত মাথা নেড়ে বললে 'চলছে কিনা বুঝতে পারছি না।' উঠে দাঁড়াল সতীনাথ, টলতে টলতে ম্যাণ্টেলপীসের কাছে গেল, ঝুঁকে পড়ে টাইমপিসটার সময় দেখে বললে, 'ওরে বাবা, দেড়টা!' ম্যাণ্টেলপীসেই বাঁধান ছোট একটি ফটো ছিল স্থহাসের। মুগ্ধ চোখে সেদিকে চেয়ে থেকে সতীনাথ কিছুক্ষণ শিস দিলে, সহর্ষ গলায় বলে উঠল, 'ফার্স্ট ক্লাস।' ফটোটা পকেটে পুরলে।

স্থহাসও উঠে বসেছিল। বললে, 'ও কী করছ।'

ফটোটা বের করে সতীনাথ ছোট্ট একটি চুমু খেয়ে ফের পকেটে রেখে ঈষৎ জড়িত গলায় বললে, 'এটা নিয়ে যাচ্ছি।' আজকের স্মরণীয় সন্ধ্যার স্থভেনীর। চলরে, স্থপ্রিয়, চারু। ঢের রাত হয়েছে।

বাসার কাছাকাছি গাড়ি আসতেই স্থপ্রিয় বললে, 'আমি এখানেই নামব।'

'বা-রে, দরজা অবধি পৌঁছে দেব না ?'

স্থপ্রিয় বললে, 'না ভাই, কাজ নেই। পাড়া-স্থদ্ধ লোক টের পাবে। অরুণা হয়ত জেগে আছে, কেঁদে-কেটে অনর্থ করবে।'

সতীনাথ বললে, 'বেশ।'

কোঁচা সামলে স্থপ্রিয় গাড়ি থেকে নামল, পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেল ওর বাসার দিকে, পিছনে, গাড়িতে, কয়েকটি ইয়ারের গলার খিল-খিল হাসি শোনা গেল। একজন বললে, 'শালা ভেড়া। কী রকম চুপি চুপি এগোচ্ছে দেখ! যেন চুরি করতে যাচ্ছে। আরে যাচ্ছিস তো নিজের বাড়ি, অত ভয় কিসের ?

সতীনাথ ইঞ্জিন বন্ধ করে ফিস-ফিস করে বললে, 'চ,' আমরাও পেছনে-পেছনে যাই চল, মজাটা দেখে আসি গে।'

স্থপ্রিয়র বাসাটা এক-তলা। বেশি দূর যেতে হল না। কাছাকাছি যেতেই সতীনাথ দেখল, ওদের ঘরের দরজা তখন আধ-খোলা, ভিতর থেকে ক্রুদ্ধ চাপা গলার গর্জন আসছে,—'কোথায় ছিলে, কোথায় ছিলে তুমি। কোথা থেকে রাত ভোর করে ফিরলে ?'

সুপ্রিয় মৃদু-ভীরু গলায়' কী জবাব দিলে শোনা গেল না, অরুণার কণ্ঠ আবার ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, 'তুমি না শিক্ষাব্রতী,—ভদ্রলোক? ছি-ছি, গলায় দড়ি দেব আমি। বিষ খাব।'

সুপ্রিয়র গলা এবার শোনা গেল, করুণ, ভাঙা স্বরে বলছে, 'কি করি টাকা ধার চাইতে সতীনাথের ওখানে গিয়েছিলুম, সে জোর করে টেনে নিয়ে গেল। আগে বুঝতে পারিনি অরুণা, পারলে যেতাম না।'

'ঘরে তোমার না ছেলের অসুখ? ওষুধ আসছে, ফল আসছে বলে ওকে কষ্টে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি, কাল কী করে ওকে মুখ দেখাব।'

ওরা সুপ্রিয়কে কাতর গলায় বলতে শুনল, 'চুপ কর ,অরুণা, চুপ কর। আর কখনও এমন হবে না, কথা দিচ্ছি,—তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি—'

কপট আতঙ্কে বন্ধুদের দিকে চেয়ে সতীনাথ বললে, 'ওরে বাপ্‌স সত্যিই পায়ে হাত দেবে নাকি। দাঁড়া, দেখে আসি।'

পা টিপে এগিয়ে সতীনাথ দরজার ফাঁকে উঁকি দিলে। যা দেখলে তাতে পলক পড়ল না। একটি বুক পলে পলে ওঠা-নামা করছে, আগুনের ফুলকি ঝরছে দু'টি কুপিত চোখে, আর তার পা দুটির উপরে অনুতপ্ত একটি মুখ রেখে সুপ্রিয় ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ফিরে এসে সতীনাথ স্টিয়ারিংয়ে হাত রাখল। প্রফুল্ল বললে, 'কী দেখলি?'

'ওরে বাবা, যেন বাঘের মাসী।'

জিভের চুক-চুক শব্দে খেদ সূচিত করে চারু বললে, 'পুওর ক্রীচার! হোয়াট্‌ এ পিটি। আমাদের বৌ কিন্তু বাবা এমন আন্‌রীজনেবল্‌ নয়। এসব ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ আর সারা রাত দাঁড় করিয়ে রেখে জেরা নেই—ভাগ্যিস্‌!'

ওদের নামিয়ে দিয়ে সতীনাথ যখন নিজের বাড়ি ফিরে এল তখন দুটোর বেশি। পথ নির্জন একটা কুকুর শুধু কেঁউ কেঁউ করে গাড়িটাকে দূর থেকে শুঁকতে থাকল। বীটের পাহারাওয়ালাটা সতীনাথকে চেনে, সে ও-পাশের বাড়ির রকে বসে ঘুমতাড়ানি খৈনি টিপে গেল। একটু আগেও বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তা এখনও ভিজে, দেবদারু গাছের পাতা থেকে টপ টপ জল ঝরছে। আকাশ মেঘে ঢাকা, সব কালি-মোছা, একাকার, পশ্চিম কোণে একটি মোটে দপ্‌ দপ্‌ করছে তারা।

পুরনো বুড়ো চাকর দরজা খুলে দিয়েছিল, কোন হাঙ্গামা হল না, কিন্তু সিঁড়িটা অন্ধকার, রেলিং ধরে ধাপ গুনে গুনে সতীনাথ উঠতে থাকল। ঠিক ভয় নয়, তবু ওর বুক দুরু-দুরু করছিল।

এই বুক দুরু-দুরু শুরু হয়েছে সুপ্রিয়কে ওর বাসার সমুখে নামিয়ে দেবার পর থেকেই। হঠাৎ ব্রেক কষে, অকারণে এ্যাকসেলেটরে চাপ দিয়ে এই ভাবটা সতীনাথ ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছে, পারেনি। সিষ্ দিয়েছে, হালকা গানের কলি, ফূর্তি পায়নি। বার বার মনে হয়েছে, যদি মণিকাও জেগে থাকে, যদি ছিঁচকাঁদুনে সুপ্রিয়র বৌটার মত এই শেষ রাতে ওকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে জেরা শুরু করে? যদি মদের গন্ধ পায়, যদি কাঁদে? তখন কি ভীরু মেনিমুখো সুপ্রিয়টার মত মণিকারও পা দু'টি জড়িয়ে ধরতে যাবে সতীনাথ, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে? না-না, সে-সব সতীনাথ কিছুতে পারবে না, ও-সব নাটক তার আসে না।

শোবার ঘরেও আলো নেবানো, এখানেই ছোট টেবিলটাতে ওর খাবার চাপা দেওয়া আছে, সতীনাথ জানে। কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়তে পারলেই ভাল হত, কিন্তু এই শেষ রাতে কোথা থেকে এত খিদে পেয়ে গেল কে জানে?

টুক করে আলো জালল সতীনাথ, নিঃশব্দে থালাটা সোজা করে রাখতে যাচ্ছিল, হঠাৎ জলের গ্লাসটা কাত হয়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

ত্রস্ত সতীনাথ আড়চোখে চেয়ে দেখল মণিকা বিছানায় উঠে বসেছে। এখুনি একটা বিদ্যুৎ, বজ্রপাত ঘটবে। সতীনাথ মাথা নীচু করে ঝোল আর ডাল একাকার করে মাখতে শুরু করেছিল, শুনল, মণিকা জিজ্ঞাসা করছে, 'এই ফিরলে তুমি?'

ঘণ্টা কয়েক সুপ্রিয়র সাহচর্যে কাপুরুষতা সতীনাথের মজ্জায় ঢুকে গেছে, নইলে সে নিজে থেকে কৈফিয়ত দিতে যাবে কেন? হ্যাঁ, আজ একটু দেরি হল—দু'টো বেজে গেছে।'

মণিকা হাই তুলে হালকা গলায় বললে, 'ওরে বাবা, দু'টো? এত রাত হয়েছে, শেষ ট্রিপে সিনেমায় গেছলুম, খেয়ে শুতে শুতে বারোটা।'

'সিনেমায় গিয়েছিলে?'

অবিন্যস্ত চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে মণিকা বললে, 'কী করি। দাদার ওখানে যাব বলে তোমার কাছে গাড়ি চেয়েছিলুম, তুমি তো

ফিরলে না। আটটা পর্যন্ত' বসে থেকে থেকে শেষ পর্য্যন্ত সিনেমায় গেলুম। কী চমৎকার করেছে ড্যানী কে, তুমি একদিন গিয়ে ছবিটা দেখে এস।'

'দেখব'।

গালে হাত রেখে মণিকা কিছুক্ষণ বসে রইল তারপর বললে, 'আসল খবরই তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। আজ মাঠে কী হল।'

সতীনাথ সংক্ষেপে বললে, 'হেরেছি।'

হাততালি দিয়ে হেসে উঠল মণিকা।—'আমি আগেই জানতুম তুমি হারবে। 'মেরী কুইনের' ওপর বাজি ধরেছিলে বুঝি ?'

'না, টেম্পেস্ট।'

তর্জনী তুলে মণিকা বললে, 'তোমাকে বলে রাখলুম এর পর দিন আমাকে নিয়ে যেতে হবে। আমি টিপ্ দেব, তুমি খেলবে, দেখি, কেমন না জিতে পার।'

সহজ গলা। অভিমান না, বাষ্প না, কান্না না। সতীনাথ বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল।

আবার ছোট্ট একটু হাই তুললে মণিকা। 'আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে। তুমি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড় তো এবার।'

হঠাৎ কী হল সতীনাথের, নেশা ছুটে গিয়েছিল, তবু মত্তকণ্ঠের নকল করে বললে, 'জানো আমি আজ মদ খেয়েছি!'

ফের মশারির ভিতরে গিয়ে মণিকা টুপ করে আলো নিবিয়ে দিলে। কপট ধমকের গলায় বললে, 'এই দুষ্টু ও-সব কী হচ্ছে!'

মরীয়া হয়ে সতীনাথ বললে, 'জানো, আমি সুহাসের ওখানে গেছলুম ? ওখানে আজ ফাইন জমেছিলো।'

তন্দ্রাজড়িত স্বরে মণিকা বললে, 'সুহাস কিন্তু চমৎকার প্লে করে। ওর 'জীবননদী' ছবিটা একদিন দেখব, পাস এনে দিতে হবে বুঝলে ?'

সতীনাথ পকেট থেকে সুহাসের ছবিটা বার করলে। 'আজ সুহাস আমাকে ওর একটা ছবি প্রেজেণ্ট করেছে।' শব্দ করে সতীনাথ সুহাসের ফটোকে চুমু খেলে। খেয়েই বুঝল, বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। এখুনি মশারি সরিয়ে বেরিয়ে আসবে মণিকা, ছবিটা ছিনিয়ে নেবে, হাতের কাছে যা পাবে তাই দিয়েই আঘাত করবে সতীনাথকে।

সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড কাটল, সতীনাথ অপেক্ষা করে আছে, কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া এল না। সতীনাথ ফটোটাকে আবার চুমু খেল,

প্রত্যুত্তরে মশারির ভিতর থেকে নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস পতনের শব্দ ভেসে এল। মণিকা ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘর অন্ধকার। চলতে গিয়ে চেয়ারটায় ঠোকর খেল, তবু বারান্দায় বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পেল সতীনাথ। এখানে ঝিরঝিরে, স্নিগ্ধ হাওয়া, ঠাণ্ডা রেলিংটা এখনও ভিজে। কোন অনর্থ হয়নি। চেঁচামিচি, কান্না কিছু না।

সুহাসের ফটোটা তখনো হাতের মুঠিতে, সেটাকে মুচড়ে মুচড়ে সতীনাথ ডেলা পাকিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিলে। তারপর সেই শুদ্ধ, অন্ধকার বারান্দায়, শেষ রাত্রে, পশ্চিম আকাশের জ্বল-জ্বলে তারাটির দিকে চেয়ে একটি ফূর্তিবাজ, প্রমত্ত কাপ্তান হঠাৎ হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল।

আনন্দ পর্বতের আড়ালে রোজই সূর্য অস্ত যায়, কিন্তু যাবার আগে নয়া রোতক রোড়ের এই বাংলোটিকে আদর করতে ভোলে না। লাল সিমেণ্ট-বাঁধানো বারান্দার উপর অনেকক্ষণ ধরে অলস, ক্লান্ত, মূর্ছিতপ্রায় পড়ে থাকে, দীর্ঘ বিলম্বিত বিদায়চুম্বনের মতো। তারপর রোদের ঠোঁট সরে, নিস্তেজ বারান্দাটিকে ঘিরে ছায়া নামে, থমথমে, গম্ভীর। লনের আঁচলে হিম হাওয়া চুপে চুপে চোখ মোছে। গেটের কাছে প্রৌঢ় প্রহরী ঝাউগাছটা এমনিতে কিছু টের পায় না; বয়সের ভারে, শকুনডানার অত্যাচারে সে বিব্রত। হাওয়া তার কানে ফিসফিস করে একটি সদ্যোবৈধব্যের খবর শোনায়, বিষণ্ণ ঝাউগাছটা তখন সহৃদয়ের মতো ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে। আনন্দ পর্বতের পিছনের আকাশ তখনও আরক্ত, অনেক দূরের কোয়্যারি থেকে খোয়া

ঘ্রাণ

ভাঙার আওয়াজ থেমেও থামে না। নয়ানজুলিতে নেমে-পড়া একটা লরী থেকে থেকে গর্জন করে ওঠে, মজুরদের তাড়া দেয়, পাথরের টুকরো বোঝাই সারা হলেই সে লম্বা ছুট দেবে, কিষণগঞ্জ রেল ইস্টিশনের দিকে একটা নেই-কাজ শান্ত্রীর মতো ইঞ্জিন কোমরে কোমরে শিকল বাঁধা বন্দী ওয়াগনের সারিকে ক্রমাগত ধাক্কা দিতে দিতে হয়রান করে তোলে, তার পিস্টনের মুঠিতে জোর ঢের, থেকে থেকে ভাঙা গলায় অশ্লীল ক্রুদ্ধ একটা শপথ উচ্চারণ করে, পারলে বুঝি দুনিয়ার সব ওয়াগনকে চুলের মুঠো ধরে মাল টানার কাজে জুতে দেয়।

পশ্চিমের বারান্দায় ডেক চেয়ার টেনে নিত্য যিনি এই দৃশ্য দেখেন তাঁর নাম কৌশল্যা উপাধ্যায়, রোতক রোডের বাংলোটির মালিক। ঝাউঝিরঝির

বাতাসের সব শব্দ ঢাকা পড়ে না, ক্যোয়ারিতে খোয়া ভাঙার প্রতিধ্বনি তিনিও শুনতে পান, ছায়ামলিন লনের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, ওর শোকের কৃষ্ণচ্ছদ বুঝি আর ঘুচবে না। অথচ মনে মনে জানেন এও ঠিক নয়, হাত বাড়িয়ে একটা স্বইচ টিপলেই খুশির নির্লজ্জ হাসি বারান্দা ছাড়িয়ে লনে ছড়িয়ে পড়বে, বিয়োগের ব্যথা ভুলতে আর কতক্ষণ। এই শুব্ধতার আয়ুও বেশি না। এখুনি একের পর এক মালবোঝাই লরি থরথর বেগে ছুটে যাবে, পীচঢালা ধর্ষিত পথটার কপালে বিন্দু বিন্দু শ্রমচিহ্নের মতো ফুটে উঠবে আলোর মালা।

—মিসেস উপাধ্যায় ?

কৌশল্যা সোজা হয়ে বসেন, ক্যাপ্‌টেন চ্যাটার্জী এসেছে। রোজই আসে, গেটের বাইরে মোটর সাইকেলটাকে থামিয়ে ঠেলে নিয়ে আসে বলে কৌশল্যা টের পান না। সম্বোধনমাত্র চকিত হয়ে ওঠেন, এক হাতে আলো জ্বালেন, ডেক চেয়ারটা এগিয়ে দেন অন্য হাতে।—বসো চটরজী।

চ্যাটার্জী বসে, কিন্তু বসেও উসখুস করে, সেটা কৌশল্যার চোখ এড়ায় না। শুভ্র সুন্দর মুখের কয়েকটি রেখা কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু কাঠিন্য-টুকুর খবর কণ্ঠও টের পায় না, সে অভ্যস্ত মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করে, চা কি বারান্দাতেই দিতে বলব ?

চ্যাটার্জী তাড়াতাড়ি বলে, কেন, চলুন ভেতরেই চলুন।

কৌশল্যা মনে মনে মজা পান, মুখেও কৌতুকের এক টুকরো হাসি খেলে যায়।—কেন, বারান্দা কি এতই ঠাণ্ডা ? বেবি কিন্তু এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি।

স্মার্ট, সুপুরুষ ক্যাপ্টেন যেন জড়োসড়ো, এতটুকু হয়ে যায়, কোন মতে বলে, বেশ তো বেশ তো, না হয় কিছুক্ষণ বাইরেই বসা যাক। আপনি ঠিক জানেন মিসেস উপাধ্যায়, আপনার কোন অসুবিধে হবে না ?

কৌশল্যা তাড়াতাড়ি বলেন, ও ডিয়ার, নো।

—এবার শীত দেরিতে পড়বে, কী বলেন।

কৌশল্যা জানেন, এ প্রসঙ্গের পরমায়ু পাঁচ মিনিট। ডালহৌসি সিমলা কসৌলির আবহতত্ত্বের আলোচনা বেশিক্ষণ চলে না। তারপর ফের ফিরে আসতে হবে এই বারান্দাটিতে, যেখানে পেট স্পেনিয়েলটাকে কৌশল্যা উপাধ্যায় লম্বা লম্বা লোমে আঙুল বুলিয়ে আদর করছেন। তার পেডিগ্রী

নিয়েও কিছুক্ষণ কথা হবে। জঙ্গী অফিসার হয়েও চ্যাটার্জী গৃহপালিত কুকুরের প্রতি বিমুখ, কিন্তু কৌশল্যার কাছে সেটা গোপন করতে গিয়ে ঘেমে উঠবে। আর, ততক্ষণ বুড়ো কালা ঝাউগাছটা যেন কতই শুনেছে এমন ভাবে হাওয়ার কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়বে, হেমন্তের আকাশ তারার ঘামাচিকুটকুট নীল পিঠটা ঘষবে মেঘের ভিজে তোয়ালে দিয়ে, চ্যাটার্জী গেটে মচমচ শব্দ হলেই বেবি এসেছে ভেবে আড়চোখে তাকাবে—ডেকচেয়ারে ডুবে গিয়ে মজা দেখবেন কৌশল্যা। কড়াভাঁজ কোর্তার ফাঁকে ক্যাপ্টেনের রোমশ বুকটার সঙ্গে কোলে-লীন স্পেনিয়েলটার মিল পেয়ে মনে মনে হাসবেন।

—জানো ক্যাপ্টেন, আমার মেয়ে বেবি প্রথমে তোমার নামটা বুঝতে পারেনি। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ক্যাপ্টেন চ্যাটার আবার কেমন নাম মা? শেষের 'জী'টা ও ভেবেছিল বুঝি সম্ভ্রমের। বুঝিয়ে দিলুম, তোমার পুরো নাম চ্যাটার্জী।

নিজের খরচায় ঠাট্টা, তবু চ্যাটার্জীকে হাসতে হল। মোটা কবজিতে বাঁধা ঘড়িতে সময় দেখল একবার, লুকিয়ে, কিন্তু বেবি এখনও ফিরছে না কেন জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না।

লনে ঘসঘস শব্দ, একটা সাইকেল থামল। একটি ছিপছিপে মেয়ে এসে দাঁড়াল বারান্দায়।

—বেবি, নটি মেয়ে, এতক্ষণে এলে? ক্যাপ্টেন সেই কখন থেকে বসে আছেন।

—সরি। অনেকক্ষণ বসে আছ? কিন্তু মা, তুমি তো ছিলে।

—আমি? কৌশল্যা লাজুক কিশোরীটির মতো হাসলেন, আই বোরড্ হিম নো ডাউট।

দু হাত তুলে নিখুঁত ভদ্রতার মুদ্রায় চ্যাটার্জী বললে, না মিসেস উপাধ্যায়, না।

—চলো এবার ভিতরে চলো। বেবি ঠিক হাত বাড়িয়ে দিল না, তবুও চ্যাটার্জী ওকে অনুসরণ করল। মিসেস উপাধ্যায় অর্ধপীত চায়ের পেয়ালাটার দিকে চেয়ে দেখলেন, ওটা শেষ করার সবুরও সয়নি, হ্যাংলা!—মনে মনে ধমক দিলেন। চিমটি কাটলেন কুকুরটাকে, সে কেঁউ করে কোল থেকে নেমে পড়ল, এক দৌড়ে চলে গেল ভিতরে। বারান্দায় কৌশল্যা এখন

একা। বাইরে চেয়ে দেখলেন, রুগ্ন জ্যোৎস্না এরই মধ্যে কুয়াশার রেশমী ফাঁস গলায় পরে মরবার উদ্যোগ করছে। সামনের উঁচুনীচু মাঠটা গড়াতে গড়াতে দূরের টিলার গায়ে ঠেকে গিয়ে থেমে গেছে। য়ুক্যালিপটাস গাছটা ঋজু শ্বেতাঙ্গের মতো, তার অস্পষ্ট ছায়া কিন্তু কালো; আঁকাবাঁকা, সাপের মতো হেলে হেলে ঘাস ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে গেছে। এতক্ষণে কৌশল্যা যেন অনুভব করলেন, এখানে ঠাণ্ডা, স্কার্ফ ভালো করে জড়ানো, তবু গায়ে কাঁটা দিল।

তিনিও কি ভিতরে যাবেন। কিন্তু ওরা তো তাঁকে ডাকল না। বেবি উঠল, চ্যাটার্জী তার পিছু নিল। শেষ-না-করা চায়ের পেয়ালাটার মতোই কৌশল্যা এখানে পড়ে রইলেন। সম্মুখের থামটাকে মনে মনে চ্যাটার্জী কল্পনা করে কৌশল্যা তাকে নিঃশব্দে টিটকিরি দিয়ে বললেন, ছি, চ্যাটার্জী, ছি। এই তোমার মিলিটারি এটিকেট। যেটুকু চা পেয়ালায় পড়ে ছিল সেটুকু লনে ঢেলে দিলেন।

ঘরে ঠক ঠক শব্দ। ওরা টেবিল টেনিস খেলছে। হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসলেন কৌশল্যা। কেন তিনি এখানে পড়ে থাকবেন। অভিমান? ওরা ডাকেনি? কিন্তু এ বাড়ীর মালিক কে। হিমের ছোঁয়ায় বা অন্য যে-কোন কারণে, একটা হাঁচি অনেকক্ষণ থেকে নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল, সেটাকে সামলে বোবা চটি পায়ে কৌশল্যা ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালেন। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে বেবির, অহঙ্কারী মেয়েটার কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। গম্ভীর গলায় কৌশল্যা বলে উঠলেন, র‍্যাকেটটা আমার হাতে দাও বেবি, তুমি হাঁপিয়ে পড়েছ। ঘাম মুছে ফেলল বেবি, সোজা হয়ে দাঁড়াল, আবদারের সুরে বলল, আরেকটু মা, আরেকটু। চ্যাটার্জী ভেরি ফাস্ট, ওর সঙ্গে খেলে তুমি দম পাবে না।

—র‍্যাকেটটা দাও। এবার এত জোরে বললেন কৌশল্যা যে বেবি ওঁর চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল। হাতে তুলে দিল র‍্যাকেট।

স্কার্ফটা ফেলে দিয়েছেন কৌশল্যা, কোমরে আঁচল বেঁধে ছুটছেন। এত জোর মনে, তবু কলিজাটা ধক ধক করে কেন, পা কেন চলতে চায় না। টেরিফিক চ্যাটার্জীর র‍্যাকেটে ঘা খেয়ে একটা বল যেন দশটা হয়ে ফিরে আসে। দু'মিনিটেই রণে ভঙ্গ দিয়ে কৌশল্যা ধপ করে সোফায় বসলেন। শাদা দাঁতের পাটি বিস্তার করে বললেন, নাউ নাউ চ্যাটার্জী, তোমার

শিভালরি নেই। মেয়েদের জিতিয়ে দিতে জানো না। ঘাড়ে গলায় রুমাল ঘসতে ঘসতে চ্যাটার্জী বলল, ফেয়ার ফিল্ড এ্যাণ্ড নো ফেভর।

ঘামে-গলা মুখখানা মেরামত করতে বেবি বুঝি আড়ালে গেছে, চ্যাটার্জীও সোফায় কৌশল্যার পাশে এসে বসেছে। পরিচারক শীতল পানীয় দিয়ে গেল। তখনও শ্রমের ক্লান্তি যায়নি, চুমুক দিতে দিতে কৌশল্যা মৃদুস্বরে গল্প শুরু করলেন। চমৎকার কাটল সন্ধ্যেটা। অনেক, অনেক ধন্যবাদ চ্যাটার্জী। উপাধ্যায় যখন মারা গেল, তুমি জানো না তখন সবাই আমাকে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকতে বলেছিল।

চ্যাটার্জী জানে। আজ নিয়ে অন্তত দশবার এ কাহিনী শুনতে হয়েছে।

পানীয়ে দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে কৌশল্যা বললেন, আমি যাইনি। রোতক রোডে ছোট এই বাংলোটি তৈরী করিয়ে নিয়েছি। দিল্লী আমি ছাড়তে পারব না, এর সঙ্গে আমার নাড়ীর টান। উপাধ্যায়ের কত স্মৃতি এখানে জড়িয়ে আছে, এখানেই তার চাকরীর উন্নতি, আণ্ডার সেক্রেটারি অবধি হয়েছিল। হঠাৎ ওপরের ডাক না এলে সেক্রেটারিও হত, হত না চ্যাটার্জী?

চ্যাটার্জী বলল, হত। রুমালে চোখ মুছলেন কৌশল্যা। কত পার্টি, কত বন্ধু, কী আনন্দে তখন দিনগুলো কেটে যেত তুমি জানো না চ্যাটার্জী। কত ইস্কুলের ফাউণ্ডার্সডেতে প্রাইজ বিলোতে আমার ডাক পড়েছে। চ্যারিটি শো করে ওয়ার ফাণ্ডে চাঁদাই তুলে দিয়েছিলাম পাঁচ হাজার টাকা। সেসব দিন আর নেই, তবু গ্রামে ফিরে যাব? রুর‍্যাল আপলিফ্‌ট? টু বী বট্‌লড আপ ইন এ ভিলেজ হাট, জাস্‌ট ফ্যান্সি। তার চেয়েও একটা বড় দায়িত্ব আমার ছিল সেটা সেদিন কেউ বোঝেনি—মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে।

—আপনার বড় মেয়েকে তো আপনি ভালো বিয়েই দিয়েছেন।

হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠলেন কৌশল্যা, ওষ্ঠাগত গ্লাসটাকে সরিয়ে রাখলেন, তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন ভালো বিয়ে? ইউ কল ইট এ ম্যাচ? না চ্যাটার্জী, না। একটা টিচিং শপের লেকচারারের চেয়ে দেবযানীর ভালো বর জুটত না আমি একথা মেনে নিতে পারি না। দেবযানী আমার অবাধ্য হয়ে নিজের সর্বনাশ করেছে, কোনদিন ও আমার ক্ষমা পাবে না।

অপ্রতিভ চ্যাটার্জী চুপ। বেবি তাড়াতাড়ি এগিয়ে কৌশল্যার মাথায় হাত রাখল। চুপ করো মা, চুপ করো। ওরা তো সুখেই আছে। মেহ্‌রাজী শিগগিরই ইউনিভার্সিটিতে কাজ পাবেন, দিদি বলছিল।

—তুই ওদের ওখানে যাস ?

বেবি মাথা নীচু করে রইল।

তিক্তস্বরে কৌশল্যা বললেন, সুখ। পথের ধারে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে যে কুকুরগুলো শুয়ে থাকে, তারাও তবে সুখী বেবি। দেবযানী আমায় ঠকিয়েছে।

বিব্রত চ্যাটার্জী কখন বেবির দিকে চোখের ইশারা করে প্রথমত বিদায় না নিয়েই উঠে গেছে, কৌশল্যা টের পাননি। বাংলোটিকে থরথর কাঁপিয়ে পর পর দু'টি লরি উধ্বর্শ্বাসে ছুটে গেল, কৌশল্যা সম্বিত ফিরে পেলেন তখন। অবসন্ন গলায় বললেন, রাত হয়েছে, এবার খেতে চল বেবি।

মাথা নীচু করে টেবিলে বসেছে দু'জন। বেবি খাচ্ছে না, নখে চাপাটি-গুলো খুঁটছে।

—তোমাকে একটি কথা বলব বেবি।

বেবি মাথা তুলল।

নৈর্ব্যক্তিক, যেন রায় পড়ছেন, এমন গলায় কৌশল্যা বলে গেলেন, তোমার ভাবভঙ্গিও কিছুদিন থেকে আমার ভালো ঠেকছে না। তুমি চ্যাটার্জীকে যেন বড়ো বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছ। মাথা নীচু কোরো না বেবি, কৌশল্যা সহসা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, জবাব দাও ?

মৃদু অশ্রুতপ্রায় কণ্ঠে বেবি বলল, চ্যাটার্জীকে আমি কথা দিয়েছি।

—কথা দিয়েছ ? কটু গলা কৌশল্যার, কয়েক মুহূর্ত নির্ণিমেষ চোখে চেয়ে রইলেন।—এরই মধ্যে ? তর সইল না ? বয়স যে তোমার এখনও আঠারো হয়নি, বেবি।

ধীর, কিন্তু দৃঢ় স্বরে বেবি বলল, তোমার হিসাব একেবারে ঠিক থাকে না মা, বাইশ পূর্ণ হয়ে গেছে।

—চুপ করো। খুব হিসাব শিখেছ বেবি ; এতই যদি হিসাবি তুমি, তবে লুথরাকে কেন আমল দিলে না, সে তো আই এ এস ; কিম্বা প্রকাশকে, সেও অল ইণ্ডিয়া রেডিওর একজন বড়ো অফিসার।

—চ্যাটার্জীও তো অফিসার, মা।

—আঃ, তর্ক, তর্ক কেবলই তর্ক। আমার কথা এই যে বেবি, এত তাড়াতাড়ি সব ঠিক করে ফেললে কেন। বাছাই করে তো নিতে পারতে। তোমাকে পিয়ানো কিনে দিয়েছি। গান আছে, পিকনিক, ঘোরাঘুরি,

টেবিল টেনিস, এত শীগ্‌গির সব শেষ করে দিতে চাও কেন।' এ কি তোমার ভালো লাগে না।

এক টুকরো ফ্যাকাশে আলো ছড়িয়ে গেল বেবির মুখে। আস্তে আস্তে বলল.—ছ' বছর ধরে টেবিল টেনিস খেলে খেলে দিদির কব্‌জি ব্যথা হয়ে গিয়েছিল মা, পুডিং তৈরী করে করে আঙুল পুড়ে গিয়েছিল তাই সে পালিয়ে বেঁচেছে।

—বেইমান। হাতে রুটির টুকরো না থাকলে কৌশল্যা বুঝি ঠাস করে চড় মেরে বসতেন মেয়েকে। রুদ্ধ শ্বাস, চোখে ফুলকি ঝরছে, যেন শুধু দাঁত দিয়ে উচ্চারণ করলেন, কিছু শুনতে চাই না। কাল রবিবার, লুথরা সকালেই আসবে। আমাদের হিন্দনের পাড়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছে। তুমি তৈরী থেকো বেবি।

আনন্দ পর্বতের আড়ালে সূর্য অনেকক্ষণ ডুবে গেছে। পাথরভাঙা কোয়্যারি চুপ, রেল সাইডিংয়ের অত্যাচারী ইঞ্জিনটাও আজ নিখোঁজ। হিন্দনের তীর থেকে পরদিন কৌশল্যা যখন ফিরলেন তখন মন কানায় কানায় ভরা। দেহের কোষে কোষে অবসাদ, একরকম টলতে টলতে নামলেন গাড়ি থেকে। তারপর গেটের সমুখে দাঁড়িয়েই আরও এক দফা বিদায় দেওয়া, নেওয়া, খিলখিল হাসি ; সর্বশেষ মডেলের গাড়িখানা যতক্ষণ না অদৃশ্য হল ততক্ষণ কৌশল্যা চেয়ে রইলেন।

বেবি দাঁড়ায়নি, বাড়ি ফিরেই সটান এসে শুয়ে পড়েছিল। কৌশল্যা আজ উদার হয়ে গেছেন, চাকর বেয়ারাদের দুটো করে টাকা দিয়ে বললেন, আজ রাত্রে আমরা খাব না, তোমরা সিনেমা দেখ গিয়ে। ঘরে এসে গরম জামাটা ছুঁড়ে ফেলে বললেন, বেবি, ঘুমিয়েছিস ?

হুঁ কি উঁহু জাতীয় একটিমাত্র অব্যয় উচ্চারণ করে বেবি পাশ ফিরল।

—চমৎকার কাটল আজ সারা দিন না ? গ্রামোফোনটা নিয়ে লুথরা ভালোই করেছিল। এত রেকর্ড, সব কি ওর ?

বেবি বলল, জানি না।

—তুই তো ভয়ে ভয়ে চান করলি না। এখন মাথা ঘুরছে তো। ঘুরবে না। ও এত স্যানডুইচ আর ডিম নিয়ে গিয়েছিল কেন রে, আমরা কি রাক্ষস ? হিহি করে হেসে উঠলেন কৌশল্যা, গলা অবধি একটা চাদর

টেনে মেয়ের পাশের খাটিয়ায় শুয়ে পড়লেন। ওর যে বন্ধুটিকে সঙ্গে এনেছিল, সেহ্‌লাল না কী নাম যেন, সেও ভারী আমুদে, এয়ার ফোর্সে কাজ করে শুনলাম। আসছে রবিবার আমাদের আবার নিতে আসবে বলে গেল। এবার যাব গুরগাঁওয়ে, সোহ্‌নার হটস্প্রিংসে। একটা গাড়ী থাকা খুব স্থবিধের, না ?

সাড়া না পেয়ে কৌশল্যা হাই তুললেন, যেন স্বগত, যেন সিলিংটাকে শুনিয়ে বললেন, চ্যাটার্জীর কিন্তু গাড়ি নেই। থাকার মধ্যে আছে ওই তো একটা ঝরঝরে মোটর সাইকেল, যেটুকু চলে তার দশগুণ গলাবাজি করে।

স্থইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দিলেন কৌশল্যা নরম মখমল অন্ধকারে ঘর ভরে গেল। বেবি শুনছে কিনা বিশ্বাস নেই, তবু বললেন, কাল বিকালে প্রকাশ আসবে, দিনের বেলা পিয়ানোতে একটু হাত লাগিয়ো আর কোথাও বেরিও না যেন।

হঠাৎ বিছানার উপর সোজা হয়ে বসল বেবি—এতক্ষণ তবে ঘুমোয়নি—ফাঁপানো অগোছালো চুলের রাশি মুখটাকে যেন দশগুণ স্ফীত করেছে, তুমি কী চাও মা, ঠিক করে বল দেখি ? চ্যাটার্জীকে তবে আসতে মানা করে দিই ?

কৌশল্যা সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিতে পারলেন না, অবাক চোখে চেয়ে রইলেন। বেবি আবার শুয়ে পড়ল। বুড়ো প্রহরী ঝাউ গাছটার আড়ালে বাসা খুঁজে মরছে কোন রাতপাখী, কৌশল্যা তার ডানার ঝটপট শুনলেন। তারপর শব্দ যখন থেমে গেল, তখন অতি ধীরে, একান্তই জনান্তিকে, তাঁর একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তাঁকে কেউ বোঝেনি, বড় মেয়ে দেবযানীও না। চ্যাটার্জী আসবে না কেন, সেও চমৎকার ছেলে, আসবে বৈকি। কিন্তু সবাই আসবে। বোকা মেয়ে, তোর গায়ে দিদির হাওয়া লেগেছে, ঘুমন্ত বেবির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন। এই করেই সব শেষ করে দিতে চাস। তোর মনে নেই বেবি, তোর বাবা যতদিন কোয়ার্টারে ছিল, আমাদের কোয়ার্টারে কত লোক আসত যেত। ব্রেকফাস্টে অতিথি, লাঞ্চে অতিথি, ডিনারেও। ডিনারের পর ব্রিজের টেবিল পড়ত। কত রাত পর্যন্ত গান, গল্প, হাসি। মিটার, চাওলা, এদের মনে নেই ? একটি মৌচাক ঘিরে অবিরল গুঞ্জন।

তুঘলকাবাদের ধ্বংসস্তূপে স্বামীর সহকর্মী রাও একবার তাঁর হাত চেপে ধরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার গালে একটা চড় মেরেছিল কৌশল্যা। রাও

রাগ করেনি, আরক্ত মুখে পালিয়েছিল। রাগ তিনিও করেননি। নিজে ঠিক থাকলেই হল। এই জীবনের উপর ধিক্কারও আসেনি। রাওকেও পরদিন চা খেতে ডেকেছিলেন।

উপাধ্যায় গেছে, জীবন গেছে, কিন্তু নেশা যায়নি তো। কৌশল্যা আজও তার গন্ধটুকু নিয়ে দিল্লীতে পড়ে আছেন।

সারা দুপুর মেয়েটাকে চোখে চোখে রেখেছেন কৌশল্যা, প্রকাশ যখন এল ঠিক তখনই বেবিকে দেখতে পেলেন না। মেয়েকে অভিশাপ দিলেন, প্রকাশকে আদর করে বসালেন ঘরে, বার বার উঠে বাইরে গেলেন বেবি নেই। রাস্তার দিকে নজর রাখতে সুবিধা হবে ভেবে কৌশল্যা শেষে বললেন, আসুন মিঃ প্রকাশ, আপনাকে আমার বাগান দেখাই। আপনি তো ফুল ভাল বাসেন নয়? একটা 'ব্ল্যাক প্রিন্স্'তুলে দিলেন বাটনহোলের জন্য। জানেন, এগুলোর ক্রেডিট বেবির। রোজেজ আর নট ইন মাই লাইন। এই যে দেখছেন, 'এ্যাডমিরাল', 'ফ্যানটাসিয়া', 'কমরেড', 'ফ্লেমিং সানসেট,' সব ওর। আমি? আই টু হ্যাভ রেইজড সাম্। ক্রিসানথিমামগুলো আমার, হলিহক আমার সুইট্-পী এখনও ভালো করে ফোটেনি, এও আমার। গেটে যে বুগাইভিলিয়া দেখেছেন এর নাম বোয়া-ভ্-রোজ, আমার বাছাই। লাইক টু সী মোর? এদিকে আসুন। কারনেশান দেখুন, শাদা, লাল, হলদে, সব মিলিয়েছি। ডালিয়া চেনেন আপনি, ক্যালেন্ডুলা? বলুন তো কোনগুলো। এই কসমীয়াগুলো নিশ্চয় আমাদের খাবার টেবিলে দেখেছেন। বর্ষায় এলে আপনাকে গ্লোব আমারান্থ দেখাতে পারতুম। এগুলোর নাম আপনাকে বোধ হয় বলে দিতে হবে না, এগুলো পীটুনিয়া।

হঠাৎ কৌশল্যা আহত স্বরে বলে উঠলেন, মিঃ প্রকাশ আপনি কিছুই শুনছেন না।

অপ্রতিভ প্রকাশ প্রথমে প্রতিবাদ করলে, পরে ভূয়সী মার্জনা চাইল। ঘরে ফিরে কৌশল্যা বললেন, আসুন আমরা একটা ছবির ম্যাগাজিন দেখি।

আদ্যোপান্ত দেখা হয়ে গেল, উইট এ্যাণ্ড হিউমারের কলম পড়ে দু'জনে একসঙ্গে হাসলেন, কখনও কখনও হুলটা কোথাও না বুঝেও, এক সেট ধাঁধার সমাধান করা হয়ে গেল, বেবি এল না।

—মিঃ প্রকাশ, আপনাকে একটা গৎ বাজিয়ে শোনাই ?

প্রকাশ শুনল, ধন্যবাদ দিল, একটা সৌজন্যসম্মত ছুতো করে সরে পড়ল।

বেবি ফিরে এল সন্ধ্যারও পরে। পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে চুপি চুপি শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কৌশল্যা কর্কশ গলায় ডাকলেন, বেবি শোন। সারা বিকেল কোথায় ছিলে ?

নিরুত্তর মেয়ে আসামীর মত দাঁড়িয়ে আছে। কৌশল্যা আবার চেঁচিয়ে বললেন, প্রকাশ এসেছিল, অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেছে জানো ?

—মা তুমি তো ছিলে,—বেবি এতক্ষণে কথা বললে, একটুও বুঝি হাসতে চেষ্টা করল, আমি জানি, অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয়নি।

—না হয়নি, কিন্তু জেনে রাখ, প্রকাশ বসেওনি, খানিকক্ষণ উসখুস করে চলে গেল। বেবি, কৌশল্যা এগিয়ে এলেন, কণ্ঠস্বর সাধ্যমত কোমল করে বললেন, বেবি, ওরা কি আমার কাছে আসে। বুঝিস না কেন, তুই না থাকলে ওরা একদিনও কি আসতো। একদিনও না।

একটু দম নিলেন কৌশল্যা তেমনি মায়ামোম গলায় বললেন, সত্যি বলতো তুই কোথায় গিয়েছিলি। চ্যাটার্জীর কাছে না ?

মেয়ের মৌনকে কৌশল্যা ধরে নিলেন স্বীকৃত, আবার যেন চোখে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বলল।—হ্যাঁ কিংবা না বল।

—গিয়েছিলাম।

—বেশ। তুমি নিজের মতে নিজের পথেই চলবে ঠিক করেছ ?

বেবি জবাব দিল না। এক পলকে ওর দিকে চেয়ে মনে মনে কী ভেবে নিলেন কৌশল্যা, বললেন, একবার ঘরে এস বেবি, তোমকে খবর দেব। কোনদিন দিতে হবে না ভোবছিলাম, কিন্তু আজ আর না দিয়ে উপায় নেই।

দরজা জানালা ভাল করে এঁটে দিয়েছেন কৌশল্যা, চাকরদের কানে একটি কথাও যেন না যায়। ঘরে শুধু মৃদু একটি বেডসাইড রীডিং ল্যাম্প্ জ্বলছে। তাতে জ্যোতি কম, ছায়া বেশি।

অতি নিচু অতি নিভৃত ভঙ্গিতে কৌশল্যা বললনে, চ্যাটার্জীকে বিয়ে করবে ঠিক করেছ, কিন্তু তুমি কি জানো বেবি, ওর,—ওর খারাপ অসুখ আছে। আর্মির লোক, ওদের কথা জানিস না তো। এখনও চিকিৎসা করছে।

—বাজে কথা, বেবি গর্জন করে উঠল।

—জানি তুই মানতে চাইবি না। কিন্তু বিশ্বাস কর, এর একটি কথাও বানানো নয়। ডাক্তারের প্রেসকৃপসনের নকল যদি দেখাতে পারি, তবে বিশ্বাস হবে?

ঘৃণা আর তিক্ততা মেশানো গলায় বেবি বলল, না, তাতেও হবে না। তোমার এত বুদ্ধি মা, কিন্তু হাতে বেশি অস্ত্র রাখোনি কেন। দিদি যখন মেহরাজীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তখন ঠিক এই কথা বলেই তার মন ভাঙতে চেষ্টা করেছিলে মনে আছে? তোমার মনে নেই, আমার আছে। মা, এক অস্ত্রে বার বার কাজ হয় না।

—অন্ধ, স্বার্থপর। কৌশল্যা এর বেশি কিছু বলতে পারলেন না।

ক্ষীণ আলোটাও নিবিয়ে দিল বেবি, বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।—তোমার কিছু ভেবে কাজ নেই মা, এবার ঘুমোও তো। কাল চ্যাটার্জী আসবে। চাওতো আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করবো।

জানালা খুলে দিতেই দমকা হাওয়া ঘরের কলিজা ফুসফুস ঠাণ্ডা নিশ্বাসে ভরে দিয়ে গেল। প্রহরী ঝাউ গাছ তাকে তাড়া দিলঃ সর্-সর্। রোতক রোডের আলোর মালা কেঁপে কেঁপে নিবু নিবু হয়ে এল। সেদিকে চেয়ে কৌশল্যা মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না।' শেষ অস্ত্র এখনও হাতে আছে। চ্যাটার্জীকে কী বলতে হবে তাও তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন।

আজ বিকাল থেকেই কৌশল্যা অস্থির পায়ে বাগানে পায়চারি করছেন। কোণের শিরীষ গাছের ডালে একটা মৌচাক হয়ে ছিল, সেটাকে আজ পাড়িয়ে এনেছেন। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। চাক নেই, তবু, গুঞ্জন। ন্যাড়া ডালটার আশে পাশে কয়েকটা মৌমাছি গুনগুন করে ফিরছে। কৌশল্যা একটা ঢিল তুলে নিয়ে ছুঁড়লেন।

রেলসাইডিংয়ে ইঞ্জিনটা রোগীর মত গলায় ককিয়ে উঠল, একটা মোটরসাইকেলের ঘসঘস শুনতে পেলেন। চ্যাটার্জী আসছে।

এই জন্যেই বিকাল থেকে কৌশল্যা অপেক্ষা করে আছেন, চ্যাটার্জীকে এখানে ধরবেন বলে।

চ্যাটার্জী সোজা বারান্দায় উঠতে যাচ্ছিল, এগিয়ে এসে বললেন, ক্যাপ্টেন, একবার একটু ওদিকে আসবেন?

ওদিকে নিয়ে গেলেন হেজের ধারে, কিন্তু প্রথমেই কিছু বলতে পারলেন না।

—ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী, আমি বেবির মুখে সব শুনেছি।

চ্যাটার্জী আরও কিছু শুনতে হবে ভেবেছিল, একটু অপেক্ষা করে আস্তে আসতে বলল, আশা করি আপনি আমাকে অযোগ্য ভাবছেন না।

—অযোগ্য? একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে কৌশল্যা বললেন, না। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী আমার ভয় অন্য বিষয়ে।

ব্যগ্র চ্যাটার্জী মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি ফেললেন কৌশল্যা, আরও একটা পাতা ছিঁড়ে নিলেন। ধীরে ধীরে বললেন, ফাঁকির ওপর তৈরি সৌধ স্থায়ী হয় না ক্যাপ্টেন। লুকোচুরি এক দিন না এক দিন ধরা পড়েই। সেদিন আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। পাতার রসে আঙুলে সবুজ রঙ্ ধরল, সেদিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কৌশল্যা যোগ করলেন, এ ভয়টা বিবাহিত জীবনে আরও বেশি। লুকোচুরিটা জানাজানি হয়ে গিয়ে অসুখ আরো বাড়িয়ে তোলে।

মূঢ় কণ্ঠে চ্যাটার্জী বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মিসেস উপাধ্যায়।

অতি সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে কৌশল্যা বললেন, আপনাদের দু'জনেরই বয়স অল্প, বেবিকে আপনি ভালো বেসেছেন। এ বিয়ে সুখের হত। আমি মা, তবু বেবির বিষয়ে আপনাকে একটি কথা জানিয়ে দিতে আমার বিবেক আমাকে বলছে। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জী, বেবি একটু হালকা ধরনের মেয়ে দেখেছন তো, ও জীবনে একবার ভুল করেছিল।

একাগ্রনেত্র চ্যাটার্জীর দিকে আবার তাকালেন কৌশল্যা, বোধহয় শ্রোতার ঔৎসুক্য বাড়িয়ে দিতে চাইলেন। —আমার বড়ো মেয়ে দেবযানী যাকে বিয়ে করেছে সেই মেহরাকে বেবিই আগেই ভাল বেসেছিল। দোষ আমারই, ওকে ঠিক মত চালনা করতে পারিনি। মেহরার সঙ্গে ও একবার ডালহৌসি পালিয়ে গিয়ে সাত দিন কাটিয়ে এসেছিল জানেন? পুরো সাতটি দিন।

আর পাতা ছেঁড়ার প্রয়োজন নেই, শেষ বিষটুকু ঢালা হয়ে গেছে। দষ্ট জীবটি ঢলে পড়ে কিনা দেখতে কৌশল্যা স্থির নয়নে তার দিকে

চেয়ে আছেন। চ্যাটার্জী বিবর্ণ হয়ে যায়নি তো, এতটুকু নুয়ে পড়েনি। খাকি পাতলুনের পকেটে হাত দিয়ে আগের মতই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে তার রেখাহীন মুখে কৌশল্যা একটুকরো হাসিও ফুটে উঠতে দেখলেন।—খবরটুকুর জন্যে অনেক ধন্যবাদ মিসেস উপাধ্যায়, কিন্তু বড় দেরিতে দিলেন। বেবিকে আমি বিয়ে করেছি।

—বিয়ে করেছ? ইঞ্জিনের মত তীক্ষ্ণ গলায় চীৎকার করে উঠলেন কৌশল্যা, হেজের গুচ্ছ ধরে নিজের শরীরের ভার সামলালেন।

—বিয়ে করেছি। চ্যাটার্জী পুনরাবৃত্তি করল।—কাল রেজিস্টারের কাছে গিয়ে নাম সই করে এসেছি। আপনার কাছে আগেই অনুমতি চেয়ে নেওয়া উচিত ছিল, নেওয়া হয়ে ওঠেনি। বেবি মানা করেছিল। সেজন্য হাজার বার মাপ চাইছি মিসেস উপাধ্যায়।

এগিয়ে গিয়ে মোটরসাইকেলটা তুলে নিল চ্যাটার্জী, গেটের দিকে যেতে যেতে বলল, সব বলে আপনি ভালই করেছেন, মা হয়ে লুকোননি, আমার অবাক লাগছে। তবে মিছে ভয় করবেন না, আমরা ফৌজী জওয়ান, এসব প্রেজুডিস নেই।

সাইকেলের পাদানিতে জুতো রেখে চ্যাটার্জী বলল, আরও একটা খবর আছে। আমি পুনরায় বদলি হয়েছি। আগামী সপ্তাহেই যেতে হবে। বেবিকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

মোটরসাইকেলের গর্জন ক্রমে-সরু-হয়ে-আসা রোতক রোডের শেষে মিলিয়ে গেছে। তখনও দাঁড়িয়ে আছেন কৌশল্যা। শিরীষের ডালটিকে ঘিরে মৌমাছির গুঞ্জন নেই। কোয়্যারি থেকে মাঝে মাঝে শুধু ঝুপঝুপ পাথর ধ্বসে পড়ার আওয়াজ। চোখের পাতা দুটি ভারী, একি শিশির। দেবযানী গেছে, আগামী সপ্তাহে বেবিও যাবে। রোতক রোডের এই বাংলোটি একেবারে চুপ হয়ে যাবে, আর কেউ আসবে না। 'কেউ না', ফিসফিস করে কৌশল্যা যেন নিজেকে বললেন। জীবনের স্বাদ তো কবেই গেছে, উপাধ্যায় যেদিন গেছে, সেদিনই ; গন্ধটুকু নিয়ে ছিলেন তাও গেল।

হঠাৎ হিংস্র হাতে দু'তিনটে ফুলের চারা উপড়ে নিলেন কৌশল্যা, ব্ল্যাক প্রিন্স্ আর এ্যাডমিরালের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিলেন।

সাহারানপুর জংশনে সম্পূরণ সিংয়ের মুখে গল্পটা শুনে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। অথচ আসলে এটি রোমান্টিক গল্প। পরদিন দিল্লী ফিরেই যদি এটি লিখতুম তবে হয়ত সেই কাঁটার কয়েকটি এই রচনাতেও ফুটত।

লিখিনি, ভালই করেছি। গল্পটাকে মনের মত করে সাজাতে চেয়েছি, পছন্দ হয়নি। ভয়ও ছিল। আমার কাছে যেটা স্পষ্ট, সেটা কাহিনীটির শ্রুতিরূপ, দৃশ্যরূপে তার কতটা ধরা পড়বে, কতটা উবে যাবে তার নিশ্চয়তা ছিল না।

তা-ছাড়া, পরে ভেবে দেখেছি, সেদিনের আতঙ্ক অনেকটাই পরিবেশজনিত। ওয়েটিং রুম-লাগোয়া রিফ্রেশমেণ্ট-কামরায় আমরা দু'জন মুখোমুখি, টেবিলে ঝকছকে কাঁটা ছুরি, ধবধবে তোয়ালে; পেয়ালা-প্লেট-

প্রতিদ্বন্দ্বী

পিরিচ, চীনেমাটির বাটি; চামচের টুংটুং ছাপিয়ে সান্টিংয়ের বাজ-আওয়াজ। কাচের শার্সির বাইরে ছমছমে ছাই রঙের জোব্বাপরা শীত-আকাশ, তার কপালে ধকধক চোখের মত দূর-ইয়ার্ডের দারুণ দু'টি ফ্লাড-লাইট। তবু মাঝে মাঝে লাইনের অরণ্যে পথভ্রান্ত দু'একটি ইঞ্জিন সিগন্যালের ইশারা না পেয়ে তীক্ষ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে। সেই চিৎকার কুয়াশাকে ছুরির মত ছিঁড়ে দিয়ে যায়।

এই পরিবেশে জোলো প্রেমের গল্পও ভুতুড়ে রূপ ধরে আসে। বিশেষ, বক্তা যদি হয় মধ্যবয়সী বলিষ্ঠ একজন শিখ, যার পাগড়িতে পাকা চুল আর দাড়িতে ঠিক বয়স লুকানো।

আজ ভাবি সেদিন যদি এক্সপ্রেসটা ফেল করে ফ্রন্টিয়ার মেলের জন্যে বসে না থাকতুম, তবে সম্পূরণ সিংয়ের মুখে এ গল্প শোনাই হত না। তাতে অবশ্য ক্ষতি ছিলনা। বাংলা সাহিত্যে আর একটি ক্ষীণায়ু কাহিনী অলিখিত থেকে যেত।

আমরা প্রায় এক সঙ্গে রিফ্রেশমেণ্ট ঘরে ঢুকেছিলুম, প্রথমে আমি, একটু পরেই সম্পূরণ সিং। টেবিলটা আগেই আমার দখলে, স্নুতরাং ওকে কিছুক্ষণ ইতস্তত করতে হল। অবশেষে দেখলুম লোকটা আমাকে অভিবাদন করলে; সবিনয়ে বললে, 'বসতে পারি?'

মূর্ত সৌজন্য হয়ে বললুম, 'অবশ্যই।' ওয়েটার যদি আসতে অতিশয় দেরি না করত তবে হয়ত আমাদের আলাপে ওখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ত; উভয়ের যে কোন একজনের উঠে যাবার তাড়া থাকলেও। বারকয়েক পরিবেশকের কৃপাদৃষ্টিলাভে ব্যর্থ হয়ে হয়ত অভিযোগের খাতায় একটা সই দিয়ে বেরিয়ে যেতুম। হাতের কাছে সচিত্র কোন পত্রিকাও ছিলনা যে না-পড়া চোখে পাতা ওলটাই।

সৌভাগ্যক্রমে দুজনেরই সেদিন প্রচুর অবসর, দু'জনেই এক ফেরি ফেল করে পরেরটার অপেক্ষা করছি। খানা-ঘরে যে হানা দিয়েছি সেও ততটা খিদে ঘোচাতে নয়, যতটা সময় কাটাতে। টেবিলটা এত বড় নয়, যে আগন্তুকের, যদিও অপরিচিত, উপস্থিতি উপেক্ষা করব।

বললুম, 'আপনিও ট্রেন পাননি?'

সম্পূরণ অন্যমনস্ক হয়ে কী ভাবছিল। প্রশ্নে চকিত হয়ে বলল, 'না। ঠিক এক মিনিটের জন্যে। অথচ ছুটতে ছুটতে এসেছিলুম।' নিজের কথা বলে অপরেরটাও জিজ্ঞাসা করা রীতি। সম্পূরণ একটু থেমে বললে, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'দিল্লী। আপনি?'

'আরও কিছুদূর—রেওয়ারি।'

এর পরের কথাটা হত 'আজ কী শীত দেখেছেন,' কিন্তু তখনই পরিবেশক সামনে এসে দাঁড়াল, স্নুতরাং দু'জনেই ভোজ্যসূচী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। তালিকাটি আদ্যন্ত পাঠের পর সম্পূরণ ফেরত দিয়ে বললে, 'কফি।'

আমার রসনা লুব্ধ হয়ে উঠেছিল, বিশেষ, তখন মনে পড়েছে তাড়াতাড়িতে ভাল করে খেয়ে আসা হয়নি। একটা রোস্ট ফরমাশ করলুম।

যেই উচ্চারণ করলুম 'রোস্ট', অমনই সম্পূরণ যেন চমকে উঠল। লোহিতাভ, পোড়াতামাটে মুখ সহসা ছাই হয়ে গেছে, ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি, একটু-বা ব্যথিত। অতি প্রকট নাকের নীচে ছুটি পোষমানা কাঁকড়াবিছেকে একটি বলিষ্ঠ রোমশ হাত এতক্ষণ সস্নেহে তা দিচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গেল। মনে হল আঙুলগুলো কাঁপছেও।

একটু পরেই রুমাল বার করে সম্পূরণ মুখের সমুখে ধরলে। এবার আমার চমকানোর পালা। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বললুম, 'মাপ করবেন, আপনি কি অসুস্থ ?'

লজ্জিত হয়ে রুমাল ফের পকেটে পুরে সম্পূরণ বললে, 'ধন্যবাদ। না-না আমার কিছু হয়নি। হঠাৎ কেমন যেন—জল আছে ?'

পরিবেশক ইতিমধ্যে আমার জন্যে জলের গ্লাস রেখে গিয়েছিল। সেটাই ওর দিকে এগিয়ে দিলুম। ঢকঢক করে গ্লাস শেষ করে ও টেবিলে রেখে দিলে, ঠক করে শব্দ হল, বুঝলুম ওর স্নায়ুভঙ্গ তখনও পুরোপুরি সারেনি। কফি এল, সেটাকেও এক নিশ্বাসে শেষ করে সম্পূরণ আমাকে মৃদু কণ্ঠে কী বললে—বোধ হয় মার্জনা চাইলে—তারপর এক রকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়েছিলুম। রোস্ট এলে কাঁটা ছুরি নিয়ে নিপুণ অস্ত্রোপচারে মন দিলুম ; এ-জাতীয় সার্জারিতে আমার দখল কিছু কম, রীতিমত নাজেহাল হয়ে সম্পূরণের বিসদৃশ আচরণের কথা একেবারে ভুলে গেলুম।

ওয়েটিং রুমে একটু ঘুমিয়ে নেব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সেখানে পদার্পণ করেই সে-আশা ছাড়তে হল। সারা ঘরে মালপত্র, আসনগুলিও খালি নেই, টেবিলের উপরে এক স্থূলতনু বৃকোদর হাত-পা ছড়িয়ে শয়ান, সম্ভবত নিদ্রামগ্ন। অধমাঙ্গের অর্ধেক আধা-পাৎলুনে ঢাকা, উত্তমাঙ্গ শুধু একটি গেঞ্জিতে—লজ্জা নিবারণের শর্ট-কাট। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ঘরর্ ঘরর্ শুনলুম ; ওই মগজে ঘুমও থাকতে চায় না, ফাঁক পেলেই পালাতে চায় তাই নাকের মুখে একটা কুকুর পুষে রাখা

হয়েছে, সে ঘর্-ঘর্ করে তাড়া দেয়, ঘুম ফের সুড় সুড় করে মগজে গিয়ে ঢোকে।

পায়চারি করতে অগত্যা বাইরে আসতে হল। প্লাটফর্মের সামান্য অংশই আচ্ছাদিত, শেডের বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটার মত হিম পড়ছে টের পেলুম। শরীরটা ইতিমধ্যেই টুপি, ওভারকোট ইত্যাদিতে ঢেকে নিয়েছি, ঠাণ্ডা লাগবার বিশেষ ভয় ছিল না। তবু লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলুম।

প্লাটফর্মের শেষ সীমানায় আবার সম্পূরণ সিংয়ের মুখোমুখি হতে হল। বুকের উপরে হাত আড়াআড়ি রেখে সেও জোরে-জোরে হাঁটছিল। বললুম, 'সর্দি-তাড়ানো মেহনত করছেন?'

এদিকে স্টল নেই, আলো এমনিই কিছু কম। সম্পূরণ থমকে দাঁড়াল। অযাচিত সম্ভাষণে নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে থাকবে, কিন্তু আমাকে চিনতে পেরেই রুষ্ট রেখা ক'টি মিলিয়ে গেল।

'আপনি? তখন যে অদ্ভুত ব্যবহার করেছি তার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিঃ—'

আমার পদবীটা জুগিয়ে দিয়ে ওকে বাক্য সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করলুম।

'মিঃ ঘোষ, বিশ্বাস করুন আপনাকে অফেণ্ড করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। অথচ কী যে হয়ে গেল—'

'আপনি নিশ্চয়ই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।'

'অসুখ? না ঠিক তা নয়, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।'

হাঁটতে হাঁটতে আবার রিফ্রেশমেণ্ট রুমের সামনে এসেছিলুম। বললুম, 'একটু বসবেন? গল্প না হোক, অন্তত এই ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।'

ওয়েটার ঘুমিয়ে পড়েছিল। এত রাত্রে প্যাসেঞ্জার এ-ঘরে ঢোকে না। কী আছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম, সব ফুরিয়ে গেছে। আণ্ডা আছে, চাই তো ভেজে দিতে পারে। আর দু'চার টুকরো মাখন-রুটি।

বখশিশ কবুল করে বললুম, 'তাই আন।' সঙ্গে সঙ্গে আড়চোখে সম্পূরণ সিংয়ের দিকে চেয়েছিলুম। রোস্টের নামে লোকটা ভয় পেয়েছিল, ডিমের নামে মূর্ছা না যায়।

সে রকম কোন দুর্ঘটনা ঘটল না।

সে-কালে ঠাকুরের নাম, নিবাস ইত্যাদি দিয়ে আলাপ শুরু হত। কিন্তু পরিচয়ের মাঝপথে সে-প্রসঙ্গ টেনে আনা চলে না। আমরা অবশ্য ইতিমধ্যে পরস্পরের নাম জেনেছি।

বাইরে শীতে কাবু রাত্রি আরও ভালো করে কুয়াশার লেপ গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। চূড়ান্ত-চড়া ফ্লাড-লাইটের আলো দুটিও এখন নেশায় ঝিমনো চোখের মত ঘোলাটে, নিবু-নিবু। মাঝে মাঝে ঘুমনো প্লাটফর্ম গমগম করে বেজে ওঠে। মেল ট্রেন নয়, মাল গাড়ি পাস করছে। কাচের শার্সিতে হিম-তুলি একটার পর একটা ছায়া-ছবি আঁকে আর মুছে দেয়।

অল্পক্ষণের আলাপ, তবু দু'জনে কখন আরও একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছি। হাঁটুর ঠক-ঠক ঠেকাতে ওভারকোট খুলে পায়ের উপর বিছিয়ে দিয়েছি। সম্পূরণের মুখের একাংশ আমার দিক থেকে ফেরান, মাঝে মাঝে একটু ঘোরায় যখন, সেদিকটাও দেখতে পাই, কিন্তু স্পষ্ট নয়। দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কিছু আছে, কিন্তু কী ঠিক ধরতে পারিনে। সম্পূরণ বুদ্ধিমান, আমার মনের কথাটা অনুমান করে থাকবে। হঠাৎ কাঁটা-ছুরি নামিয়ে রেখে বললে, 'বার বার তাকিয়ে কী দেখছেন শিরমানজী আমার বাঁ চোখটা পাথরের।'

টেবিলের তলায় পা দু'টি সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠেছিল মনে আছে। ওয়েটারটা ঘরের এক-পাশে কুণ্ডলী হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, ত্রিসীমানায় আর কেউ নেই। ঘরের বাইরে নীলকোর্তা দু' একটা কুলিকে চলাফেরা করতে দেখেছি বটে, কিন্তু কাচের দরজা-জানালার এ-পাশ থেকে আমায় চোখে তারা ছায়ামূর্তি বই নয়।

"আমার বাঁ চোখটা পাথরের।' মনে হল ঠিক এমনি অনায়াসে সম্পূরণ বলতে পারে, আমাকে যেমন দেখছেন আমি তেমন নই। এই পাগড়ী, দাড়ি আর পোশাকের ঠিক নিচেই একটি কঙ্কাল ঢেকে রেখেছি। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ সম্পূরণ সে-সব কিছু বললেনা, এক হাতে তর্জনী দিয়ে দিয়ে অপর হাতের বালাটা ঠুনঠুন বাজতে থাকল। বোঝা গেল উত্তেজিত হয়েছে। হঠাৎ সোজা হয়ে বসল সম্পূরণ, আমার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললে, 'একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলেই তো পল্টনে কাজ হলনা, নইলে রাওয়ালপিণ্ডির জোয়ান ট্যানারির টাউট হয়েছে, শুনেছেন কোথাও ?'

ভালো করে ওর গল্প শোনবার জন্যে, কিংবা লুপ্ত সাহস ফিরে পেতে, সিগারেট ধরিয়ে বসলুম। শিখদের এ-সব ব্যাপারে রীতিমত শুচিবাই তাই আগে-ভাগে ওর অনুমতিটাও চেয়ে নিতে ভুলিনি।

সম্পূরণ বললে, 'বয়স হল, কিন্তু খেতের কাজে মন বসল না ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। তন্দুর-চাপাটির খোঁজে না ঘুরেছি এমন জায়গা নেই, শিবালিক পেরিয়ে চলে গেছি, কুলুভ্যালী, চম্বায়, কসৌলি, মসুরী, চক্রাটা। লাহোর, হোসিয়ারপুর, ফিরোজপুর, আম্বালা, দেহলি—কোথাও সুবিধে হল না। শেষ পর্যন্ত চলে গেলুম কানপুরে, ট্যানারির দালালি জুটল। টন-টন চামড়ার কারবার, আমার উপর কাঁচামাল জোগান দেবার ভার পড়ল। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতুম, মরা গোরু বাছুরের খোঁজ করতুম। কয়েকটা কসাইখানার সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল।

'প্রথম প্রথম ভাল লাগতো না। মনে হয় পেটের ধান্দায় কী মহাপাপই করছি। মাঠে মাঠে গোরু চরে, খাটালে ভইস বিচালি খায়, দুধ ঢালে আমাকে দেখলেই ওরা ড্যাবডেবে চোখ মেলে চাইত, যেন ধমকাচ্ছে, যেন দুষছে। আমি শয়তান, ওদের দুশমন, সেটা ওরাও যেন জানত। হয়ত আমারই ভুল, কিন্তু মনে হত।

'মুশকিলে পড়লুম লড়াই বাধলে। কারখানা থেকে হুকুম হল আরও চামড়া যোগান দাও। ওরা একটা স্যাড্‌লারি ফ্যাক্‌টারির কনট্রাক্ট নিয়েছিল। হাজার-হাজার ঘোড়ার জ্যান্ত চামড়ার উপর মরা চামড়া চাপিয়ে লড়াইয়ের কাজে লাগান হবে।

'আমার ঘোরাঘুরি আরও বেড়ে গেল, কিন্তু যোগান দিয়ে ওদের খুশি করতে পারলাম না। আরও চাই, আরও, আরও। জেলায় জেলায় টাউট ঘুরছে, আমার ভাগে পড়ল দেহলি আর হরিয়ানা। মরীয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত কী করলুম জানেন? গোপনে গোপনে কড়া বিষ যোগাড় করে নিলুম। শেষরাতের অন্ধকারে খানিকটা করে ছড়িয়ে দিয়ে আসতুম মাঠে, যেখানে পরদিন সকালে গোরু চরতে আসবে।

'রোজই দু'একটা মরত। একলা মাঠে গিয়ে তাদের দেখে আসতুম, কিন্তু তাদের ঠাণ্ডা, স্থির, নীল চোখের দিকে চাইতে পারতুম না। দেশে থাকতে আমার নিজেরই একটা প্রিয় গাই ছিল, ক্যাম্বেলপুরের গাই,

মিশমিশে কালো রঙ, উটের মত উঁচু, বয়েলের মত জোয়ান, কিন্তু দু'টি চোখ। তার কথা মনে পড়ে যেত। সব বিষনীল গোরুর চোখে আমি সেই ক্যাম্বেলপুরের গাইটার চোখ দেখতে পেতাম।

'তবু সে-কাজ ছাড়িনি। পেটের জ্বালা এমন, মাঠ থেকে ছুটে যেতুম মালিকদের কাছে। বাকি বন্দোবস্ত করা শক্ত হত না। শস্তাই পড়ত।'

হঠাৎ থামল সম্পূরণ। তোয়ালের ঠোঁট মুছল। ঈষৎ লজ্জিত, হেসে বললে, 'কিন্তু আমি আমার গল্প তো আপনাকে শোনাতে চাইনি! তখন কেন হঠাৎ উঠে গিয়েছিলুম তার কৈফিয়ৎ দিতে চেয়েছি। বাজে কথা বড় বেশি হয়ে গেল।'

বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল। প্লাটফর্মটা আবার চকিত, কুলীরা ব্যস্ত, হাতগাড়ি ঠেলে ঠেলে ভেণ্ডরেরা এ-প্রান্ত ও প্রান্ত অবধি ছুটছে। ক্লান্ত, ভাঙা-ভাঙা গলায় স্থর করে বলছে, 'সমোসে গরম—চায়!'

সম্পূরণ একবার উঁকি দিয়ে দেখে এল।—'অমৃতসর-হাওড়া মেল। আমাদের গাড়ির এখনও অনেক দেরি।

দুর্জয় শীতে ঘুম দেশ ছাড়া। হাই তুলে বললুম, 'ততক্ষণ গল্প চলুক।'

আমার ছমছমে ভাব কেটে গিয়েছিল। এই লোকটার একটা চোখ ঝুটো হতে পারে কিন্তু বাকিটা রক্তমাংসের, খাঁটি, অনুমাত্র সংশয় নেই।

সম্পূরণ তখন ওর ঢিলে কোটের পকেট থেকে ছোট একটা শিশি বার করলে; প্যাক-করা, কিন্তু কিসের, বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরি হলনা। সসঙ্কোচে আমার দিকে চেয়ে বললে, 'চলে?'

বললুম, 'চলে, কিন্তু চালাবনা। রেল-পুলিশের হাতে পড়তে ইচ্ছে নেই।'

'মিছে ভয় পাচ্ছেন। সভ্যদেশে বথ্‌শিশ আর ঘুষ নামে দুটো জিনিস আছে। একটিতে কাজ না হয় আর একটিতে হবেই।'

উত্তেজিত লোককে ঘাঁটান বৃথা। চুপ করে রইলুম। আলোর সম্মুখে গ্লাস উঁচু করে ধরে সম্পূরণ মাত্রা ঠিক করলে। টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে বললে, 'রোস্ট খেতে দেখে কেন ভয় পেয়েছিলুম এবার সে-কথা আপনাকে বলি।'

মনে আছে চোখ দু'টি বিস্ফারিত করে তন্ময় হয়ে অনেকক্ষণ ধরে সম্পূরণ সিংয়ের গল্প শুনেছিলুম। মাঝে মাঝে হাত হিম হয়ে গেছে,

ওভারকোটের কর্কশ পিঠে ঘষেছি; দূর ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে হঠাৎ থেমে কোন ইঞ্জিন তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করেছে, চমকে উঠেছি। কানের নরম লতিতে একটা মশা বারবার বসে উৎপাত করেছে, মারতে হাত তুলিনি।

কাহিনীটা সম্পূরণ একাই বলে গেছে। খাবার টেবিলে নুনের ডিবে, সসের বাটি এগিয়ে দেবার মত আমি মাঝে মাঝে দু'একটা বলে ওকে খেই ঠিক রাখতে সাহায্য করেছি মাত্র।

সম্পূরণ বললে, আমার পেশার কথা আপনাকে বলেছি। এই পেশাই লড়াইয়ের শেষ দিকে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল গুর-গাঁওয়ের এক গাঁওয়ে। এক ট্যাঁকে বিষ আর এক ট্যাঁকে তাড়াতাড়া নোট নিয়ে সেখানেই ক'দিনের জন্যে আস্তানা গাড়লুম। একে গ্রাম, তাতে লড়াই চলেছে, খাবার জিনিস আক্রা। আণ্ডা আর মীট মোটে নেই, সব্জিও যা হয়, বেশির ভাগ চালান যায় শহরে। পাওয়া যেত দুধ—গোয়ালারা রাতেই সাইকেলে টিন ঝুলিয়ে দেহলির পথে রওনা হত। মনে হত যেন জোলুশ চলেছে।

মাঠে প্রথমেই সেঁকো বিষ দিলুম না, সোজা পথে চামড়া সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলুম। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ি, মাঠে মাঠে ঘুরি। অড়্হর আর গেঁহুর ক্ষেতে একদিন পথ হারিয়ে ফেললুম। ঘুরে ঘুরে হয়রান—সেটাও শীতকাল, তবু, গায়ে ঘাম ছুটল। যেদিকে চাই, একটা মানুষ দেখতে পাইনে। ঝিলের ধারে, ঘাসের ঝোপে টীল ডাক, নাইটের কিচির-মিচির শুনি, আমার পায়ের আওয়াজে তারা পলকে পালায়। অনেক দূরে দূরে দেখি খুব বড় বড় পাখি মাটির খুব কাছ দিয়ে, অথচ মাটি না ছুঁয়ে উড়ে চলেছে। এত বড় পাখি, আর মাটির এত কাছে? নজর করে বুঝলুম হরিণ। কখনো হরিণের ছুটে চলা দেখেছেন? হরিণ তো ছোটে না, ওড়ে।

অনেক ঘুরতে ঘুরতে উঁচুমত যে জায়গাটাতে এসে দাঁড়ালুম, সেটা একটা রহ্‌ট। ইঁদারার মধ্যে ছোট ছোট বাটি ঘুরে ঘুরে ক্ষেতে জল ছড়ায়, আপনাদের দেশে আছে কিনা জানিনা। ইংরেজীতে বলে পার্সিয়ান হুইল।

সেই কুয়োতলায় তাকে প্রথম দেখলুম। ডালায় সবজি—মুলো, খিরা, আরো কত কী মনে নেই—রহটের জলে ভিজিয়ে নিচ্ছে। তেষ্টা পেয়েছিল, হাত পেতে বললুম 'আমাকে দুটো।'

সঙ্গে সঙ্গে দিলে না, কিন্তু মুখ তুললে। তাকে দেখতে পেলুম। ঘাঘরাটা ময়লা, ওড়নাও ছেঁড়া, কিন্তু মুখখানি ভারি মিষ্ট। আর যেটা ভালো লেগে ছিল সেটা ওর আব্রু। শহরে শহরে ঘুরে মেয়েদের সম্বন্ধে সব মোহ ঘুচে গিয়েছিল বাবুজী, ওদের শরীর নিয়েও কোন আগ্রহ ছিল না। দেখেছেন তো, ওরা লড়াইয় হেরে-যাওয়া ফৌজের মত শুধু নিজেদের পিঠ দেখাতে ভালবাসে?

আস্তে আস্তে মেয়েটি ওড়নায় মুখ ঢেকে দিলে। ওকে ইতস্তত করতে দেখে বললুম, 'কই দাও? পয়সা দেব।'

একটি খিরা দুটি মুলো নিলুম। আঁচলা পেতে খেলুম রহটের জল। মেয়েটির কাছে তারপর পথের খোঁজ নিলুম। শুনলুম, আমকে আরও দু'মীল যেতে হবে। মাইলের আন্দাজ এদের কখনও ঠিক হয় না, ধরে নিলুম অনেক মাইল হাঁটতে হবে—দুই হতে পারে, আবার দশও। সেই কুয়োতলাতেই জিরিয়ে ফের চলতে শুরু করব স্থির করলুম।

হঠাৎ কোথায় যেন ঝটপট-ডানা একটা আওয়াজ। চমকে দেখি একটা রাজহাঁস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জলের নালা ধরে খেতের দিকে যাচ্ছে। এতক্ষণ ডালার আড়ালে ছিল দেখতে পায়নি। মেয়েটিও তার পিছনে ছুটছে, কিন্তু হাঁসটা ততক্ষণ গেঁহুর সবুজে ডুবে গেছে। একটু পরে মেয়েটিও সেখানে ডুবে গেল।

উঠে এল একটু পরেই। এক হাতে রাজহাঁসটার সরু গলা ধরে আছে, আর এক হাতে ঘাঘরার প্রান্ত ওড়না খসে গেছে, আলোর উপর পাতলা পা দুটি ফেলে উঠে আসছে। কাছাকাছি আসতে ওর কপালের ঘাম, ঘননিটোল বুকের ওঠা-পড়া দেখতে পেলাম।

এসে আর বসল না। রাজহাঁসটাকে কাঁখে আর ডালাটাকে মাথায় নিয়ে দাঁড়াল।

মাঠের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে, আমি পিছে পিছে। আমার ভারী জুতোর থপ-থপ শুনে দাঁড়ালে। ঘাড ফিরিয়ে বললে, 'আসছ যে।'

বললুম, 'পথ দেখিয়ে দেবে।'

মুখ ঘুরিয়ে ও আবার নীরবে এগোতে থাকল। পাশাপাশি পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের ঘর কতদূর ?'

জবাব এল না। চুপচাপ হাঁটছি। খানিকক্ষণ পরে শুনতে পেলুম, 'তুমি এখানে এসেছ কেন ?

আমার পেশার কথা ওকে বলতে সঙ্কোচ হল। শুধু বললুম, 'কাজে।'

দীর্ঘ পথ এক সঙ্গে চলতে হলে আড়ি আপনা থেকেই ভেঙে যায়। কখন মেয়েটির সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে শুরু করেছি, মেয়েটিও জবাব দিচ্ছে, খেয়াল করেনি। কথায় কথায় জানলুম ওদের ঘর আমি যে গাঁয়ে উঠেছি তার কাছেই। কতটা পথ তার হিসেব মাইলে নিলুম না। জেরা করে জানলুম, ওদের বাড়ি থেকে টাটকা টাটকা দুধ দুইয়ে নিলে আমার ওখানে পৌঁছতে ফেনা মরে না।

সঙ্গে সঙ্গে বললুম, 'তবে তুমি আমাকে রোজ আধ সের দুধ দিও। যে কদিন আছি। দাম নগদ পাবে।'

চোখ তুলে ও একবার তাকালে। মাথা নিচু করে বললে, 'আচ্ছা।'

জেরা করে আগেই জেনেছিলুম ওরে মুখ্য জীবিকা এইটেই। ওর শ্বশুর আগে রোজ সাইকেলে দুধ নিয়ে দিল্লী যেত। এখন বয়স হয়েছে, রোজ পারে না।

'শ্বশুরের ছেলে নেই ?'

'আছে। লড়াইয়ে।' আমি যে পাশে আছি, সে দিকটা ওড়নায় ঢাকা, ওর মুখ দেখতে পেলুম না। না চোখের পাতা-কাঁপা না গালের লাল।

ওর নাম অহল্যা। হিন্দু। জানেন ত, হরিয়ানা-প্রান্তে শিখ কম হিন্দু বেশী। আপনার শুনতে খারাপ লাগছে শিরমানজী ?

চোখে ঈষৎ ঘোর লেগেছিল। ট্রেনের ভাবনা ঘুচে গেছে, মনে হয়েছিল সাহারানপুর জংসনের এই রিফ্রেশমেন্ট-রুমটাই এখুনি দুলে দুলে চলতে সুরু করে দেবে, আমাকে কাল সকালে পৌঁছে দেবে দিল্লিতে। বললুম, 'বলে যাও।'

সম্পূরণ সিং আরেক মাত্রা নিজের গ্লাসে, এক মাত্রা আমারটায় ঢেলে জল মিশিয়ে দিলে।

—খেয়ে নিন, তখন যা বলব তা আরও মিঠে লাগবে। পরদিন সকালে অহল্যা দুধ নিয়ে এসেছিল। মাথায় সব্‌জির চুবড়ি, সেখানে দুধের ঘট বসানো, চলকে পড়েনি এই আশ্চর্য। কোলে সেই রাজহাঁসটা।

বললুম, 'আজও এটাকে সঙ্গে এনেছ?'

কিছু না বলে অহল্যা হাসল।

'উড়ে যায় যদি?'

'উড়বে না। আমাকে ছেড়ে ও কোথাও যাবে না। রোজ তো ওকে ঝিলে ছেড়ে দি। সাঁতরে সাঁতরে আবার ঠিক ফিরে আসে।'

দুধ ঢেলে দেবার সময় ওড়না সরে গিয়েছিল, ওর দীর্ঘ টানা চোখ দুটি দেখতে পেলুম। অহল্যা আজ সুর্মা লাগিয়ে এসেছে।

শুধু দুধ নয়, সব্‌জিও কিছু রাখলুম। বললুম, 'আণ্ডা দিতে পার?'

'আণ্ডা কোথায় পাব?'

হাঁসটার দিকে আঙুল দিয়ে বললুম, 'কেন এটা পাড়ে না?'

অহল্যা ফের মুখ নিচু করলে। পরে বুঝেছিলুম অল্পেই লজ্জা পাওয়া ওর অভ্যাস।—'এটা মরদ হাঁস জী।'

আমার যে কাজ, তাতে খুব ভোর ভোর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া নিয়ম। মাঠের কোণে তাঁবু, রোজ তিন চারটে কম্বল চাপিয়ে শীতের হামলা ঠেকাই। পরদিন সকালে কিন্তু বেরোতে পারলুম না। রোদ উঠে ঘাসের কান্না মুছে দিলে, শুয়ে শুয়েই দেখলুম। ভাবলুম আজ বড় ঠাণ্ডা, বেরিয়ে কাজ নেই। তারও পরে ও এল।

সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলুম। ধমক দিলুম নিজেকে। তবে কি শীতের ভয়টা সাচ্চা নয়, আমি ওরই অপেক্ষায় শুয়ে ছিলুম, ও না-আসা পর্যন্ত বেরোতে মন চাইছিল না, আর সেই দুর্বলতা-টুকুই আলস্যের ঘোমটা পরে এসেছে?

অকারণেই রূঢ় হলুম, ওর উপরে! বললুম, 'যা এনেছ, রাখ ওখানে।'

অহল্যাও কথাটি বললে না, দুধ আর সব্‌জি নামিয়ে রাখল। চোখ বুজেই ওর হাতের বালার রুনঝুন, আর কোলের রাজহাঁসটার ঝটপট শুনলুম।

পরদিনও অহল্যা এল, কিন্তু অনেক দেরি করে। তার ঢের আগে আমি উঠেছি, তাঁবুর পর্দা খুলেছি বন্ধ করেছি, বিরক্ত হয়ে কিংবা নিজেকে একটা কাজে ব্যস্ত রাখতে, আঙ্গিঠা জ্বেলে চা করতে বসেছি।

তাঁবুর বাইরে ছায়া পড়ল। অহল্যা মাথায় এসেছে। সব্‌জির চুব্‌ড়ী কিন্তু কোলের হাঁসটি নেই। বললুম, 'আজ তোমার এত দেরী হল ?' ধমকের চেয়ে গলায় অভিমানটাই বাজল, টের পেয়ে লজ্জা পেলুম। সেটা চাপা দিতেই জিজ্ঞাসা করলুম, 'হাঁস কই তোমার ?'

'ঘরে রেখে এসেছি। সর্দারজী, চম্পকের ভারি অসুখ।'

চম্পক তবে রাজহাঁসটার নাম। কিন্তু হাঁসের আবার কী অসুখ। শুনলুম, কাল থেকে ও নাকি কেবলি ঘর-দোর নোংরা করছে, খায়নি কিছুই, নিঝুম হয়ে খুপরিতে পড়ে আছে।

'হাঁসের অসুখের কোন দবাই নেই ?'

অবশ্যই আছে। কিন্তু আমার জানা ছিল না। বললুম, 'মণ্ডির কাছে ডাক্তারখানা আছে, সেখানে খোঁজ নিতে পার।' হাসি চাপতে রীতিমত বেগ পেতে হল।

সেদিন বিকেলে সুই-শীত, শরীরটা গরম রাখতে হাঁটতে শুরু করলুম।

কাচের শার্সি ফোঁটা ফোঁটা হিমে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, সেদিকে চেয়ে সম্পূরণ সিং বললে, শিরমান্‌জী, হরিয়ানার মাঠে এর চেয়েও বেশি শীত পড়ে। যাক, ঘুরতে ঘুরতে একটা ঝিলের কাছে গিয়ে পড়লুম। আশে-পাশে ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘর, বুঝলুম একটা গাঁয়ের কাছে এসেছি। অন্ধকার হয়ে এসেছে, ঝোপঝাপের ফাঁকে ভালো নজর হয় না, হঠাৎ একটা হাঁসের ডাক শুনে চমকে উঠ্‌লুম। সব শেয়ালের এক রা, সব হাঁসেরও সম্ভবত তাই, তবু মনে হল এ চম্পক না হয়ে যায় না। কোথা থেকে ডাকছে ভাল করে দেখব বলে লম্বা লম্বা ঘাস সরিয়ে ঝিলের একেবারে কিনারে গিয়ে উঁকি দিলুম।

দেখি কোমরভর জলে অহল্যা দাঁড়িয়ে। হাতে ছোট ছোট নুড়ি, জলে একটার পর একটা ছুঁড়ছে, হাল্কা হাল্কা ঢেউ গোল হয়ে ঝিলের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে; অহল্যা মাঝে মাঝে সুর করে অর্থহীন কয়েকটা বুলি আওড়াচ্ছে। সেটা হাঁস-ডাকার মন্ত্র।

আমাকে দেখে অহল্যা চুপ করে ভিজে কাপড়েই তাড়াতাড়ি উঠে এল। চোখে সুর্মা নেই, মুখে ওড়না নেই, পরনের ঘাঘরাটাও ভিজে গিয়ে এখন আর আবরণ নয়, গায়ের চামড়ারই আরেক পরত-মাত্র

হয়েছে। হাঁটু থেকে পাতা অবধি ওর শরীরটা আমি যেন অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কাঁদো কাঁদো মুখে, অহল্যার আজ অন্য কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নেই, বললে, 'চম্পক পালিয়ে এসে আজ জলে ঢুকেছে। এদিকে ওর অসুখ ও ঠিক মরে যাবে। ওকে কী করে ফেরাই বলুন তো।' বলে নিজেই আবার ছোট ছোট নুড়ি ছুঁড়তে লাগল, সুর করে ডেকে গেল হাঁসটাকে।

একটু পরে পাড়ের নরম কাদায় ছড়ানো পায়ের পাতায় ছাপ রেখে রেখে চম্পক নিজেই উঠে এল। অহল্যা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ওকে জড়িয়ে ধরল; কোনদিকে না চেয়ে, আমাকে কিছু না বলে, ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল।

পরদিন সূর্য উঠে দেওদার গাছটার পল্লবের ফাঁদে ধরা দিয়েই পাতা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তাঁবুর কানাতে ঝিকিমিকি রোদ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, অহল্যার তখনও দেখা নেই। আশা ছেড়ে দিয়ে ঘরময় অস্থির পায়ে ঘুরছি, দেখি মাঠ পাড়ি দিয়ে এক বুড়ো এদিকেই আসছে। তাঁবুর বাইরে পৌঁছে লোকটা ডালা নামিয়ে হাঁপাতে থাকল, তামাটে মুখে ঘাম। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, 'অহল্যা বলে এখানে কেউ রোজ—'

বললুম, 'হ্যাঁ, এখানেই। তুমি ওর শ্বশুর? অহল্যা এল না কেন? চম্পকের বুঝি বেশী অসুখ?'

গলায় ঠাট্টার ছোঁয়া ছিল। লোকটা অবশ্য সেটা টের পেলে না, বিনীতভাবে বললে, 'না, অসুখ অহল্যার নিজের। কাল হাঁসটাকে খুঁজতে সন্ধ্যার পরে অনেকক্ষণ বাইরে ছিল, জলেও ভিজেছে। হাঁসটার জন্যই বেটি একদিন মরবে।'

'ওটাকে খুব ভালবাসে বুঝি?'

ফোকলা মুখের মাড়ি বের করে বুড়ো শিশুর মত হাসল।—'খুব। ওকে ও শুধু তা দিয়ে ফোটায়নি, নইলে আর সবই করেছে। আমার ঘরে গেলে দেখতেন হাঁসের খোপটা উঠোনে নয়, ঘরের ভেতরে, অহল্যার বিছানার ঠিক পাশেই। প্রথম প্রথম বকতুম, এখন কিছু বলি না। একটু বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু ওর দোষ কী সর্দারজী। ঘর খালি, আমরা দুজন মাত্র থাকি। একটা বাচ্চা পর্যন্ত নেই।'

বলেই বুড়ো উঠছিল। অনেক বেশি বলে ফেলেছে ভেবে লজ্জা পেয়েছে। বললুম, 'লালা, ব'স। এত তাড়া কিসের।'

ডালটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বুড়ো বললে, 'এখান থেকে মণ্ডিতে যাব। এগুলো বিক্রী করে ফিরতে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যাবে।'

ওর শিথিল চামড়া আর তোবড়ানো গালের দিকে চেয়ে বললুম, 'এই বয়সেও এত পরিশ্রম করছ, তোমার ছেলে শুনেছি লড়াইয়ে গেছে, সে কিছু খরচ পাঠায় না ?'

দেখলুম লোকটার মুখ রক্তলেশহীন হয়ে গেছে। মাথা নিচু করে বললে, 'আমার ছেলে লড়াইয়ে গেছে আপনাকে কে বললে ?'

বললুম, 'অহল্যা।'

বুড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে, চোখ মাটিতে রেখেই, বললে, 'অহল্যা মিছে কথা বলেছে সর্দারজী। আমার ছেলে জেলে।'

'জেলে !'

'গিয়েছিল। এতদিন তার খালাস হয়ে বেরিয়ে আসারও কথা। গাঁয়ের লোকে অনেক কথা রটায় সর্দারজী। কেউ কেউ নাকি ওকে দেহলির চৌরিবাজারের একটা গলিতে দেখেছে।'

চৌরিবাজার অঞ্চলের সুনাম ছিল না। চুপ করে রইলুম। বুড়ো নিজেই বললে, 'ওমপ্রকাশ এখন নাকি তবলচি হয়েছে। আর দিনে ওকে দেখা যায় ফতেপুরির ভিড়ে। আপনি নিশ্চয়ই দেহলি যান। খোঁজ নেবেন ?'

একটা জোয়ানের চেহারা যেন চোখের সমুখে ভেসে উঠল। রাতে নাচের সঙ্গে যে সঙ্গত করে, দিনে ফতেপুরিতে পরের পকেট হাতড়ায় !

'ওমপ্রকাশ জেলে গিয়েছিল কেন ?'

লোকটা অনেকক্ষণ ইতস্তত করলে। বোধ হয় বলবে কি বলবে না স্থির করতে পারছে না। কিন্তু গ্রামের মানুষ স্বভাব-সরল, বেশিক্ষণ কথা চেপে রাখতে জানে না। অতি মৃদু, অতি সঙ্কুচিতভাবে বললে, 'সেও শরমের কথা সর্দারজী। গাঁয়েরই একটা লোককে ও ছুরি মেরেছিল। মা নেই, ছেলেটা বচপন থেকেই দলে মিশে আর শহরে ঘোরাঘুরি করে নষ্ট হয়ে যায়। এক-রোখা, চটলে আর কোন হুঁশ থাকে না।'

'কিন্তু ছুরি মেরেছিল কেন?'

বুড়ো আবার ঢোঁক গিললে। মাটিতে রাখা চোখ দুটোই ফেরালে এদিক ওদিক। ডালাটাকে শক্ত করে ধরলে, যেন একটা নির্ভর চাইছে। প্রাণ গেলেও আসল কথাটা ফাঁস না করে দেবার মত মনের জোর খুঁজছে। ওর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আবার বললুম, 'ছুরি মেরেছিল কেন?'

'অহল্যা মাঈয়ের মত মেয়ে হয় না, কিন্তু তাকে সন্দেহ করত। সেই লোকটাকে অহল্যার সঙ্গে বার দুই কথা বলতে দেখেছিল।' বলতে বলতে অহল্যার শ্বশুর যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'লোকটা নেহাত বরাত জোরে বেঁচে গেল, তাই ওমপ্রকাশের ফাঁসি হল না। ঝোপের ধারে লোকটা মুখ থুবড়ে পড়েছিল, কতক্ষণ কে জানে, সকালে আমরা দেখি। খুন জমে কালো কালো চাপ বেঁধেছে, তখনো ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে। পাশেই একটা নহর—তার জল লাল হয়ে গিয়েছিল সর্দারজী।'

বুড়ো হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁপছিল। ঘরের কথা প্রকাশ করার লজ্জা, নিজের ছেলেকে ভালো না বাসতে পারার লজ্জা।

বললুম, 'তুমি এবার যাও, লালা। সময় পেলে বিকেলের দিকে তোমার বাসায় যাব।'

সময় পেয়েছিলুম। আমাকে দেখে ত্রস্ত অহল্যা তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল, এক দিনের অসুখ চুলগুলো রুক্ষ, মুখখানি নীরক্ত-রুগ্ন। চম্পক ওর কোলেই, সরু সরু মোম-আঙুল শাদা পালকে বুলিয়ে দিয়ে অহল্যা আদর করছে।

এখন ভাবি সেদিন কী ছেলেমানুষি করেছিলুম। অল্প পরিচিতা একটি গ্রাম্য মেয়ে যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শুধু দুধ আর সব্জি যোগান দেবার, সামান্য অসুখের খবর পেয়েই তাকে দেখতে ছোটা ঠিক হয়নি। সেদিন এতটা বিচার করিনি, দেখেছিলুম আমার পায়ের শব্দে ওর উজ্জ্বল দুটি চোখ, গায়ের কাপড় টেনেটুনে আরেকটু সম্বৃত হওয়ার প্রয়াস।

'তোমাকে দেখতে এলুম অহল্যা। কেমন আছ?'

'ভালো।'

'আর তোমার চম্পক?'

পাণ্ডুর মুখে সিঁদুর ছড়িয়ে পড়ল। বললে, 'সে-ও ভালো।'

আরও দু-চারটি কথা বলতে চাই, খুঁজে না পেয়ে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠি। বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে বললুম, 'বড়ো ঠাণ্ডা।'

'জী হাঁ।'

'আবার মেঘ করেছে। বর্ষা নামলে ভারী অসুবিধে হবে। বরফ পড়বে, না?'

'পড়তে পারে।'

অহেতুক, অর্থহীন আলাপ। শেষ পর্যন্ত মনে মনে আমার অচতুর রসনাকে ধিক্কার দিয়ে উঠে আসব, দরজা পর্যন্ত এসেও গেলুম। ফিরে তাকিয়ে দেখি কালো-কালো চোখ মেলে অহল্যা এক দৃষ্টে আমাকেই দেখছে। মনে হল কিছু বলতে চায়।

বললুম, 'কী, অহল্যা।'

জামার ভাঁজ থেকে সসঙ্কোচে একটা চিঠি বের করে অহল্যা আমার হাতে দিলে।

'আজকের ডাকে এসেছে। পড়ে দেবেন?'

দ্রুত হাতে খামটা ছিঁড়লুম। উর্দু হরফ ভালো পড়তে পারিনে কিছু সময় লাগল। চিঠিটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললুম, 'তোমার স্বামীর চিঠি। শীগগির এখানে আসতে পারে লিখেছে। আর—আর', অল্প একটু কেশে সঙ্কোচ জয় করে বললুম 'তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছে।'

নিষ্প্রভ মুখে লজ্জার ছোপ দেখব ভেবেছিলুম। পরিবর্তে কঠিন একটি মুখভঙ্গী দেখতে হল। তিক্ত স্বরে অহল্যা বললে, 'ভালোবাসা!'

স্বল্পালোক ঘরে দীপ্ত দুটি অস্বাভাবিক চোখ জ্বলছে, চম্পকের পালকে সঞ্চরমান আঙুলগুলো দ্রুততর। তাড়তাড়ি পালিয়ে এসেছি ঝোপ ডিঙিয়ে, মাঠ পেরিয়ে তাঁবুর কাছাকাছি এসে স্বস্তি পেয়েছি। তীক্ষ্ণ-তিক্ত একটি স্বর তখনো কানে বাজছে, আর নহরের পাশে আহত, রুধিরাক্ত একটি লোককে ঈর্ষা করেছি। শুধু সন্দেহবশেই হয়ত ওম্‌প্রকাশ তাকে ছুরি মারেনি।

মাথায় চুবড়ি, কোলে হাঁস, অহল্যা পরদিন খুব ভোরে, প্রায় আলোক ফোটার আগেই এল। পা দুটি কাঁপছে, কথা বলবার সময়ে

গলাও। অসুখের দুর্বলতা এখনও যায়নি। দুধ নামিয়ে রেখেই বললে, 'আমাকে একটা চিঠির মুসাবিদা করে দিন সর্দারজী।'

'কী লিখতে হবে।'

'ও—ও যেন এখানে না আসে।'

'স্বামী ফিরে আসুক তুমি চাওনা?'

অহল্যা বললে, 'না। ওর কোন পতা ছিল না, সেই ভাল ছিল। ঢের সুখে ছিলুম।'

ওকে কথা দিলুম, চিঠি খসড়া নিয়ে বিকেলেই ওদের বাড়ি যাব। চম্পকের দিকে আঙুল দেখিয়ে ঠাট্টা করে বললুম, 'ওর খোপটা এবার বিছানা থেকে সরিয়ে উঠোনের কাছে রেখে দিও।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রুষ্টস্বরে অহল্যা বললে, 'কেন?'

একটু ভয় পেলুম। কোনমতে জবাব দিলুম 'এমনি। ওমপ্রকাশ কি এতটা পছন্দ করবে।'

অহল্যা বললে, 'আমি ভয় পাইনে।'

কানাডা-ইঞ্জিনের ভাঙা-মোটা গলার আওয়াজ, আবার একটা গাড়ি এল। চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম, সম্পুরণ সিং উঠে গিয়ে দেখে এসে বললে, 'এ-গাড়ি মীরাট পর্যন্ত যাবে। ফ্রণ্টিয়ার মেল আসতে এখনও আধ ঘণ্টা দেরি আছে।' তিন-পোয়া-শেষ বোতলটা দেখিয়ে বললে, 'এটা ফুরোবার আগেই গল্পও ফুরোবে। বাকিটা শুনুন।'

বিকেলের অনেক আগেই সেদিন সূর্য ফেরার। তাঁবুটা থেকে থেকে থরথর কাঁপছে। ঝড় উঠেছে। খোলা মাঠের উপর দিয়ে হাঁটছি, এক একটা ঝাপটায় কাত করে ফেলছে, তবু চলছি। নেশার টান এমনই।

অহল্যাদের দরজায় গিয়ে টোকা দিলুম, সাড়া নেই। জঞ্জাল, গোবর, ছাইয়ের গাদা, তারই উপর দিয়ে বাড়িটার চারপাশে ঘুরলুম। দিন নিবু-নিবু, এরই মধ্যে কখন শিলাবৃষ্টি শুরু, হয়ে গেছে, মাথা বাঁচাতে একটা চালার নীচে দাঁড়াতে হল। শীতার্ত একটা কুকুর হঠাৎ কেঁদে উঠল, জানি না কখন ওর লেজ মাড়িয়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাড়ির জানলার একটা পাল্লা খুলে গেল, চম্পকের হলদে ঠোঁট দুটি দেখতে পেলুম। শিলাবৃষ্টি অগ্রাহ্য কয়ে এগিয়ে গেলুম। চম্পকের ঠিক পিছেই এক জোড়া কালো চোখ, অন্ধকারে মনে হল ভীত।

ফিস ফিস করে অহল্যা বললে, 'কী চাই কী?'

তীব্র শীতে দাঁতে দাঁত লেগে যায়, বললুম 'চিঠিটা এনেছি।' হাত বাড়িয়ে ওকে দিতে গেলুম, ও নিলে না, ত্রস্ত স্বরে বললে, 'ছিঁড়ে ফেলুন ছিঁড়ে ফেলুন চিঠি। দরকার নেই।'

'দরকার নেই, অহল্যা?'

'না। ও আজ দুপুরে এসেছে।'

তবু বুঝি স্তম্ভিত কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিলুম। জানালার পাল্লাটা টেনে দিলে অহল্যা, ওর বিহ্বল-ব্যাকুল গলা শুনলুম, 'আর আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে যান। ও হয়ত আপনাকে দেখে ফেলেছে। আপনি জানেন না ও কী শয়তান, কী নিষ্ঠুর। কী কী করে ঠিক নেই।'

কাপুরুষের মত, দ্রুত পায়ে সেদিন পালিয়ে এসেছি। হাওয়ায় হাজার হিম-ছোবল, কানের দুপাশে অগণন শিস। বিদ্যুতের আলোয় একটি ছুরি ঝলসানো, একটি ক্রূর-বিচিত্র হাসি দেখলুম।

তাঁবুর একটা দিক উড়ে গিয়েছিল, অনেক চেষ্টাতেও সেটা ঠিক করতে পারলুম না। খাটিয়ায় ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সারারাত প্রায় জেগে কাটাতে হল। কাঁচা চামড়ার খোঁজে এখানে আসা, কিন্তু সে-চেষ্টা এ-কদিন বিন্দুমাত্র করিনি। তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনা নিয়েও বারবার নিজেকে প্রশ্ন করলুম, তবু কী মোহে এখানে পড়ে আছি।

আসবেনা ভেবেছিলুম, তাই অহল্যাকে পরদিন দেখে কম অবাক হইনি। ঝড় নেই, কিন্তু আকাশ এখনও কালো। মাঠের দিকে চেয়ে ওকে বললুম, 'এক রাতে কত ঘাসের ফুল ফুটেছে, দেখেছ। একেবারে ছেয়ে গেল।'

অহল্যা মৃদু গলায় বললে, 'ফুল নয়, বরফ।' পায়ের একটি পাতা অল্প একটু তুললে। দেখলুম সেখানে রক্তের চিহ্ন মাত্র নেই। বললুম, 'এই শীতেও হাঁসটাকে এনেছ?'

'ঘরে রেখে আসতে ভরসা হলনা।'

এতদিন লক্ষ্য করিনি আজ দেখলুম চম্পকের হলদে ঠোঁট দুটির উপর নিরীহ দুটি চোখ। সে-চোখে আতঙ্ক স্পষ্ট।

অহল্যা বললে, 'আমি যাই। ও হয়ত এসে পড়বে। হয়ত এসেছে। আড়াল থেকে দেখছে।'

বাধা দিইনি। আরও ভাল করে কম্বল জড়িয়ে বিমূঢ়ের মত খাটিয়ায় বসেছিলুম।

তখনও বেলা যায়নি, সেদিনই ওমপ্রকাশ এল। তাঁবুর বাইরে ছায়া পড়েনি, আকাশে আলো ছিলনা। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দেই এসেছিল, তবু চমকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম. 'কে ?'

পরনে ডোরা কুর্তা আর ঢিলে পায়জামা, ওমপ্রকাশ ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

—'আমি। পরিচয় দিলে হয়ত চিনবেন। অহল্যা আমার স্ত্রী। এখানে তো সে প্রায়ই আসে, না ?'

'সে তো দুধ দিতে।' নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছিলুম, নইলে কৈফিয়ত দিতে যাব কেন।

'দুধ দিতে।' স্পষ্ট দেখতে পাইনি, তবু ওমপ্রকাশের মুখে একটু হাসি খেলে গেল অনুভব করলুম।—'সে যাই হোক, আজ সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।'

নিমন্ত্রণ ? কিসের ? মনে আছে এই দুটি কথা বলতেও গলা কেঁপেছিল।

'বিশেষ কিছু না, ছোট-খাট একটা উৎসব। ঘরের ছেলে ফিরে এসেছে কিনা, তাই। ভাবনা করবেন না, খাবারের বন্দোবস্ত ভালই হয়েছে। রোস্ট হবে—আপনি রোস্ট ভালবাসেন সর্দারজী ?'

হালকা গলা, যেন ঠাট্টা করছে। তবু ভরসা পেলুম না, খুঁজে খুঁজে দেশলাই বের করে আলো জাললুম। ওম্প্রকাশ হাসছে।

তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে ওকে কী বলতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ আমার সারাদেহ শক্ত, সমস্ত কথা রুদ্ধ হয়ে গেল। ওর হাতের দিকে এতক্ষণ তাকাইনি, দেখিনি ওর করতল কাঁচা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, রক্তের ছিটে ওর পায়জামা-কুর্তাতেও।

আড়ষ্ট স্বরে বলতে গেলুম, 'তুমি কী···অহল্যাকে—'

বাকিটা ওমপ্রকাশই অনুমান করে নিলে। কুৎসিত একটা হাসি কষের মত যেন দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। —'হল না। ভুল ভেবেছেন। অহল্যাকে নয়, তার হাঁসটাকে এই শেষ করে আসছি। জোয়ান হাঁস, কী তাজা খুন দেখেছেন। ফিরে গিয়ে ওটাকে তন্দুরে চড়াব। আপনি খাবেন অহল্যাকেও খাওয়াব। সেটা আরও কড়া শাস্তি হবে, না ? আরেকটু

এগিয়ে আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ওমপ্রকাশ বললে, 'যাকে বিছানায় তুলেছিল, তার মাংস চাকতে অহল্যার মন্দ লাগবে না, কী বলেন !'

যেমন এসেছিল, তেমনি অকস্মাৎ ওমপ্রকাশ সেদিন অন্তর্হিত হয়েছিল। কখন খেয়াল করিনি। সেদিনই তাঁবু গুটিয়ে পালিয়ে এসেছি। ঘোর দুর্যোগ, ট্রেণ যেন থর থর করে কাঁপছে, সমস্ত রাত্রি এক ফোঁটা ঘুমোতে পারিনি, কী দেখেছি জানেন ? রক্তাক্ত ছুরি-হাতে ওমপ্রকাশ ওর ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে, অহল্যা খেতে বসেছে। টপ-টপ চোখের জলে একটি ঝলসানো মাংসের টুকরো নোন্‌তা হয়ে উঠেছে। বাবুসা'ব, সেই থেকে কোনদিন রোস্ট খেতে পারিনি t

জানালার শার্সি কেঁপে উঠল। গমগম ব্যস্ততা, কুলি আর ভেণ্ডারেরা হঠাৎ জেগে উঠেছে। বাইরে উঁকি দিয়ে সম্পূরণ সিং বললে, 'ফ্রণ্টিয়ার মেল এল।'

শেষ রাতে আলো জ্বলে ওঠে। রোজ। তখন দুটোর কম না, তিনটের বেশি না। খাট থেকে হঠাৎ নেমে পড়ে একজন লোক, অস্থির পায়ে পায়চারি শুরু করে। বুকের উপরে আড়াআড়ি রাখা বলিষ্ঠ দুটি বাহু, অবিন্যস্ত দীর্ঘ চুল, উদ্‌ভ্রান্ত, আবিল দৃষ্টি।

ওদের জানালায় ফিকে নীল পর্দা, তবু সরু প্যাসেজের এ-পাশের মুখোমুখী ঘর থেকে অনেকটাই চোখে পড়ে। অস্পষ্ট, ছায়া-ছায়া নিস্তব্ধ শেষ যাম, দু'চারটে কথাও শুনতে পাই। রোজ একই নাটকের অভিনয়।

পুরোপুরি দেখিনি, শুনিনি, তবু এদেরই নিয়ে আজ গল্প লিখতে বসেছি। হয়ত কিছুটা আভাস-আড়াল ছিল বলেই লিখছি, কল্পনার সুতো কিছুটা খুলেছে। সবটা জানলে হয়ত এ-গল্প রচনার আগ্রহই থাকত না।

অমিত্রাক্ষর

ঘুমের ওষুধের শিশিটা শিয়রেই থাকে। হাতড়ে হাতড়ে সেটিকে মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়েছি। দম বন্ধ করে অপলক চোখে চেয়ে আছি ওপাশের জানলার দিকে।

এই তো লোকটা বসে পড়েছে টেবিল-আয়নার সম্মুখে। কী যেন খুঁজছে। ওর হাতে উঠে এল একটা ব্রোচ, না, ছোট একটা হাতঘড়ি। সেটাকে কানের কাছে নিয়ে লোকটা ক্ষীণ টিক টিক শুনলে। ফের রেখে দিলে।

এবারে সম্মোহিত চোখে চেয়ে আছে আয়নায়, প্রতিচ্ছবি দেখছে। দীর্ঘ চুলগুলো ঠেলে দিলে পিছনে, তাই ওর ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু

নার্সিসস্ হাসি দেখতে পেলুম। লোকটি সুপুরুষ, খাঁড়ালো নাকে স্পর্ধা, প্রশস্ত ললাট, দীপ্ত দৃষ্টি, ধীরে ধীরে হাসি মিলিয়ে গেল, মুখের পেশী কঠিন, হঠাৎ টুল ছেড়ে দাঁড়াল লোকটি। ফিরে গেল খাটটার কাছে, মশারির ভিতরে হাত বাড়িয়ে কাকে জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে থাকল।

জানি এখুনি মশারি সরিয়ে বেরিয়ে আসবে একটি মেয়ে। সুন্দরী নয়, ময়লা, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। বোকা বোকা দুটি চোখ, এখন ফোলা ফোলা কিন্তু সন্ত্রস্ত, বেশবাস শিথিল।

ওকে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে বসবার সুযোগও দিলে না লোকটা, আসুরিক বিক্রমে জাপটে ধরল দুটি হাত, নিষ্ঠুর মুঠিতে মেয়েটির কব্জি মুচড়ে দিতে দিতে বলল, 'বল, বল, সে কে। তার নাম বলতেই হবে আমাকে।'

যন্ত্রণায় মেয়েটির চোখে জল এসে গেছে, দাঁতে ঠোঁট চেপে বুঝি একবার সামলে নিলে নিজেকে, নিস্তেজ, রুদ্ধস্বরে বলল, 'কেউ না, কিছু না।'

'কেউ না কিছু না?' নিষ্ঠুর গলায় লোকটিকে হেসে উঠতে শুনলুম, হঠাৎ মেয়েটিকে বুঝি ছেড়ে দিয়েছে, টাল সামলাতে না পেরে মেয়েটি মুখ থুবড়ে পড়েছে মাটিতে, তার পরে শুধু ক্ষীণ একটা কান্না, গোঙানি। লোকটিও তাড়াতাড়ি হাঁটু ভেঙে বসেছে মাটিতে, লুণ্ঠিত একটি মুখ কোলে টেনে নিয়েছে।

একটু পরেই আলো নিভে গেল।

পাশ ফিরে শুয়ে পডলুম, আজকের মত যবনিকা এখানেই। ঘুমের ওষুধের শিশি থেকে গুনে গুনে দু'টি পিল মুখে পুরলুম। দেখি, বাকি রাতটা যদি আচ্ছন্ন ভাবেও কাটে।

মাত্র এইটুকুই আমার দেখা। বাকিটা একটি অসুস্থ, অর্ধজাগর মস্তিষ্কের রচনা। এক নৈশ নাটকের অলক্ষ্য দর্শক আমি, ইন্‌সম্‌নিয়ার কয়েদি, জপমালার মত ঘুমের ওষুধের শিশির পিল গুনে গুনে যার রাত কাটে। খোলা জানালার বাইরের মিটমিটে তারাদের সব কটিকে চিনে ফেলেছি, জানি শিকারী কালপুরুষের তূণে ক'টি তীর; কৃত্তিকা আর্দ্রা, মৃগশিরার মধ্যে কোনটি ক্ষয়রুগ্ন, চাঁদের প্রিয়তমা; সামনের নিম-গাছটার ডালে কখন এসে পেঁচা বসে, তক্ত-পোষের ফাঁক থেকে কখন ছারপোকারা পা টিপে টিপে উঠে আসে রক্ত খেতে, লাজুক লেজকাটা টিকটিকিটা

ছাতের 'কোণে লেজ-ওলা টিকটিকিটার কাছে ঘেঁষে আসে, সব আমার জানা। মধ্যরাত্রে মল্লিকবাড়ির সেজ-বাবু নিজের বাড়ির কড়া ধরে জোরে জোরে নাড়েন, কিন্তু তার আগেই তাঁর ঘোড়ার গলার ঘণ্টা শুনেই টের পাই কে এসেছে। জানি রাত্ত তখন ঠিক একটা। ঘড়ি দেখতে হয় না। আরও পরে যুধবীর সিং ট্যাক্সি তোলে গ্যারেজে, ততক্ষণ জগলু তার রিক্সাটি নিয়ে ভয়ে ভয়ে চুপে চুপে দাঁড়িয়ে থাকে। তার রিক্সার ঘন্টিও চিনি!

একটু পরেই নীচের ঘরে দীনুবাবুর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ঘুম ভাঙে আট নম্বরের মাস্টারমশায়ের ছেলেমেয়েদের। ছোট মেয়ে ঘুন্টি তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করে, তার কাঁথা বদলাতে মাস্টায় মশায়ের স্ত্রীকে বাতের ব্যথা ভুলে উঠতে হয়। ওঠেন কিন্তু গজগজ করেন। কাঁথা বদলে কিন্তু মেয়ের পাশে গিয়ে শোন না, স্বামীর কাছে সরে আসেন। মাস্টারমশাই চমকে বলেন 'কে', বোধহয় অন্ধকারেই বালিশের নীচে নিকেলের চশমাটা খোঁজেন।

এ-সবই আমার জানা। বিনিদ্র বিছানায় শুয়ে রাতের পর রাত দেখেছি, শুনেছি, অনুভব করেছি।

মাস্টারমশায়ের আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না, কিন্তু আমার রক্তস্রোত দ্রুত, শ্বাস রুদ্ধপ্রায়। এবার সামনের ঘরে আলো জ্বলে উঠার পালা। এখুনি বুঝি লোকটা লাফিয়ে পড়বে মেজেয়, খানিক পরে নিষ্ঠুর মুঠিতে একটি মেয়ের নরম কবজি মুচড়ে দেবে।

লোকটার নাম জানি শিশিরেন্দু।

সকালে রোজ উঠতে দেরি করে। ওই মেয়েটি, ওর স্ত্রী চায়ের পেয়ালা নিয়ে এসে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে থাকে, বোধহয় ডাকতে সাহস পায় না। স্নান সেরে এখন নতুন রূপ মেয়েটির, শ্যাম, স্নিগ্ধ। কাল রাতে আতঙ্কের কাঁটা ফুটেছিল মুখে, আজ তার চিহ্নমাত্র নেই।

শিশিরেন্দু অবশ্য একটু পরেই ওঠে। হাত বাড়িয়েই কাপটা নেয়, খবরের কাগজে চোখ বুলোয় ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে, 'ইস বড্ড বেলা হয়েছে দেখছি। সীতা, তুমি খেলে না?'

মাথা নিচু করে সীতা আস্তে আস্তে বলে, 'খাব?'

উচ্চস্বরে হেসে ওঠে শিশিরেন্দু, বলে, 'এটাও কি আমার মত নিয়ে করতে হবে? তুমি কি নিজের ইচ্ছায় কখনই কিছু করবে না সীতা?'

হাসতে হাসতে বলে বটে, কিন্তু দেখতে পাই শিশিরেন্দুর ঠোঁটের কোণটা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠেছে। ভয়ে ভয়ে চেয়ে থাকি। এখুনি আবার ক্ষেপে উঠবে না তো লোকটা, কঠিন হাতে মেয়েটির কবজি চেপে ধরবে না ?

কিন্তু রাতের পালার আর পুনরভিনয় হয় না। শিশিরেন্দু হাই তুলে বিছানা ছেড়ে উঠে, বাজারে যায়, ফিরে আসে, স্নান সারে তারপর পাড়ার আর দশজন বাবুর মতই অফিসে দৌড়য়। দৌড়য়, তবু গলি-টুকু না ফুরোন পর্যন্ত ফিরে ফিরে তাকায়। জানালার নির্নিমেষ সীতা।

সীতাকে দুপুরের দিকেও মাঝে মাঝে দেখি। কাপড় শুকোতে দিতে ছাতে এলে কতদিন চোখে চোখ পড়ে গেছে। প্রথমে সরিয়ে নিয়েছে চোখ, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও। কোনদিন দেখেছি মাদুরে শরীর ঢেলে দিয়ে অলস হাতে পুরোনো পত্রিকা বা গল্পের বইয়ের পাতা ওলটাতে। আর পাঁচজন বৌ-ঝিয়ের মতই। শুধু কোন কোনদিন শিশিরেন্দু দুপুরেই এসে পড়ে। তাড়াতাড়ি বইটা বালিশের নীচে লুকিয়ে ফেলে সীতা. মুখেও এক পরত মসলিন-ছায়া ঘনিয়ে আসে কি।

—এতদূর থেকে টের পাইনে।

বিছানাটাতেই বসে পড়ে শিশিরেন্দু, সীতার আঁচলে ঘাম মোছে। বলে, 'হঠাৎ এসে পড়লুম, শরীরটা একটু খারাপ লাগল।'

ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে সীতা, বলে, 'কী হয়েছে, মাথা ধরেছে বুঝি ? ওডিকোলনের শিশিটা আনি ?'

ওকে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেয় শিশিরেন্দু। 'কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু বসে থাক।' অমনই পাতের কাছে শান্ত বেড়ালটির মত সীতা বসে পড়ে।

আমি জানি এই শিষ্টতা মিথ্যে, একটু আগেকার ব্যস্ততাও মিথ্যে যেমন মিথ্যে শিশিরেন্দুর শরীর খারাপটা, ওটা নেহাৎই হঠাৎ বাড়ি ফেরার ছুতো। সীতাকেও ভালও বাসছে শিশিরেন্দু, আবার সঙ্গে সঙ্গে হাতে-নাতে ধরে ফেলার সুযোগও খুঁজছে।

শিশিরেন্দুকে বলতে শুনলুম 'যাও সীতা, কাপড়টা ছেড়ে একটা ভাল শাড়ি পরে এস।' সীতা উঠে গেল, মিনিট কয়েক পরে পাশের ঘর থেকে নতুন

হয়ে এল। চোখ ফেরাতে পারলুম না। কালো এই মেয়েটির কালো হরিণ-চোখ না থাক, শ্রী আছে।

শিশিরেন্দুও মুগ্ধ গলায় বলে, 'বাঃ।' পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে যায়। কঠিন ভঙ্গিতে হেসে বলে, 'তুমি শাড়ি বদলে এলে কেন?'

ভয়-পাওয়া সীতাকে এবারে সত্যিই কালো দেখায়। জড়োসড়ো হয়ে বলে, 'বাঃ রে, তুমি বদলে আসতে বললে, তাই...'

উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল শিশিরেন্দু।

'—আমি বললুম, তাই? একবারও জিজ্ঞেস করলে না কেন? আচ্ছা সীতা, আমি যদি তোমাকে এখন একশোবার ওঠ-বোস করতে বলি, তুমি বোধহয় তাও কর, না?'

মাথা নীচু, সীতা কাঁপতে থাকল, শিশিরেন্দু ঘরের মধ্যে পায়চারি করল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ বলল, 'চল সিনেমায় যাব।'

বলা বাহুল্য সীতা বিনা বাক্যে ওকে অনুসরণ করল।

এই দ্বন্দ্ব দেখছি ওদের ফুলশয্যার রাত্রি থেকেই।

ক'দিন আগে শিশিরেন্দু নিজেই এসে বাসা ভাড়া করে গিয়েছিল। একে একে পিসিমা-মাসিমা জাতীয়া দু'চারজনও এলেন। তাঁরা অভিভাবিকা-স্থানিয়া নন, শিশিরেন্দু নিজেই দেখেশুনে পছন্দ করে বিয়ে করছে, এঁরা এসেছেন শুধু শুভকর্মের অনুষ্ঠানটুকুর তত্ত্বাবধান করতে।

বৌ দেখেই পিসিমার মুখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, তবু স্ত্রী-আচার পর্যন্ত মুখ বুঁজে ছিলেন। তারপরেই শিশিরেন্দুকে ডেকে নিয়ে গেলেন, বেশী দূরে নয় তবু আড়ালে।

—'এ কী মতিচ্ছন্ন হল তোর শিশির, দেখেশুনে একটা পেত্নী ঘরে নিয়ে এলি?'

—'পিসিমা, চুপ কর।'

—'কেন করব চুপ। আর জিনিসপত্র, গহনা দানসামগ্রী যা দিয়েছে তাও তো নামমাত্তর। পণও তো কিছু নিসনি শুনলুম।'

মাসিমা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'ওসব জিনিস কি মেয়ের বাপ দিয়েছে নাকি। সব তো শুনলুম বেনামীতে কিনে দিয়েছে শিশির—'

—'শাশুড়ি মাগি মন্তর জানে।'

—'আঃ পিসিমা, চুপ কর। সীতা শুনতে পাবে যে।'

—'শুনুক। যা বলবার আমি শুনিয়েই বলব। আমার ভাসুরঝি মিলিকে পছন্দ করলিনে তুই, সে তো কলেজে পড়ছিল, তা ছাড়া ওকে তো ওর বাবা সোনায় মুড়ে দিতে চেয়েছিল।'

পিসিমার গলা ক্রমশ চড়ছে, শিশিরেন্দু নববধূর কান বাঁচাতে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়ল।

তবু সীতা বুঝি শুনতে পেয়েছিল। নববধূর চোখ দুটোই শুধু ঘোমটায় ঢাকা থাকে, কিন্তু কানে তো ঠুলি থাকে না। পিঁড়ির ওপর আড়ষ্ট একটি পুঁটলির মাথাটা আরও যেন নুয়ে পড়ল, স্পষ্ট দেখেছিলাম।

পরদিন বৌভাত। সারাদিন অতিথির আনাগোনার বিরাম নেই। বিকেলের দিকে দল বেঁধে এল কয়েকটি মেয়ে, সম্ভবত সীতারই সখী, সমবয়সিনী। ওদের পেয়েই সীতার মুখে এক ঝলক হাসি ফুটেছিল, দরজা ভেজিয়ে ঘোমটা খসিয়ে কত গল্প।

উপহারগুলো ঘাঁটাঘাটি করল সকলে, ঝুঁকে। শেষে ক্লান্ত হয়ে বলল, 'বাব্বাঃ, এত জিনিস পেয়েছিস তুই? এই ঘড়িটা কে দিয়েছে রে,—শিশির-বাবু? এই নেকলেসটা? ফাউন্টেন পেন? সব? ধন্যি মেয়ে তুই। অনেক অপেক্ষা করে তবে পেয়েছিস।'

একজন বলল, 'ছবি তুলিসনি? প্রিণ্ট হয়ে এলে আমাকে এক কপি দিস।'

সঙ্কুচিত হয়ে সীতা বলল, 'কী করবি।'

—'বাঁধিয়ে রাখব। লজ্জা পাচ্ছিস তোকে তোর বরের পাশে মানায়নি বলে? না হয় তোরটা কেটে শুধু তোর বরেরটাই রাখব। ভয় কী, কায়াটিকে তো তুই বেঁধে রাখবি, আমি শুধু ছায়াটুকু বাঁধিয়ে রাখব।'

মেয়েটি হেসে উঠল, কিন্তু, লক্ষ্য করলুম, সীতা হাসতে পারলে না।

আর একটি মেয়ে বললে, 'প্রীতি একেবারে হিংসেয় জ্বলে মরছে। জানিস তো ওর সঙ্গেও একবার শিশিরবাবুর বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল?'

আবার সবাই হেসে উঠল. সেই মেয়েটি প্রীতিও। একটু পরে কপট ভ্রূভঙ্গি করে বলল, 'বয়ে গেছে, আমি জ্বলব কোন্ দুঃখে। জ্বলছে আমার মা। জানিস সীতা, তোর বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর থেকে মা কেবলি গজগজ করছে। বলে, গরিবের ঘরের কালো মেয়ে নাকি ভাল ঘরে পড়ে না, তবে আমাদের সীতার এমন বরাত খুলল কোথা থেকে। আমার জন্যে,

ভাই সেই থেকে যত দোজবরে, আধবুড়ো ধরে ধরে আনছে। তা, তারাও পছন্দ করে না। মা বলে তুই নিশ্চয় কোন ছলাকলা জানিস। সত্যি জানিস নাকি ভাই, সীতা? শিখিয়ে দিবি?'

এরই কয়েক ঘণ্টা পরে সেই নাটকটা অভিনীত হতে দেখেছিলুম।

অনেক জোড়া জুতো আর কলহাসি এক হয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গেল বলের মত, একটু পরে সদরে ছাড়ি-ছাড়ি দু'একটা গাড়ির গর্জনও শোনা গেল শিশিরেন্দুকে আস্তে আস্তে তখন উঠে দাঁড়াতে দেখলুম। তবু চৌকাটে দাঁড়িয়ে কয়েক পলক অপেক্ষা করল, বোধহয় নিশ্চিন্ত হতে, সবাই সত্যিই চলে গেছে কিনা। তারপর হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিল।

শাড়ি-গহনা পরে জবুথবু যে-মেয়েটি তখন থেকে একঠায় বসে, সে হয়ত একটু চমকে উঠেছিল। কিন্তু শিশিরেন্দু দেখতে পেলে না। ম্যাণ্টেলপীসে রাখা ঘড়িটায় সাড়ে দশটা—ডিসেম্বরের শেষ, রাত কিছু গভীর বৈকি।

জানালার বাইরে অগুনতি মিটিমিটি তারা, শিশিরেন্দু কতক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকত কে জানে, হঠাৎ তর্জনীর কাছে গরম একটু সেঁকের মত লাগল, চমকে দেখল প্রায়-শেষ সিগারেটটা, মনের ভুলে টানা হয়নি। ফুলদানী থেকে শিশিরেন্দু ডাঁটাশুদ্ধ একটা রজনীগন্ধা তুলে নাকের কাছে নিয়ে এল। একাসনে বসে থাকা যে-মেয়েটি এতক্ষণ আয়না, সোফা, ব্রোঞ্জ-নটরাজের মত ঘরের আসবাবমাত্র হয়ে ছিল, সে নড়ে উঠল একবার, হয়ত অস্বস্তিতে কিংবা মশা তাড়াতে।

ইশারায় শিশিরেন্দু ডাকল, এস।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, শিশিরেন্দুর চোখে চোখ রেখে হাসতে চাইল, পারল না, মাথা নিচু করল।

শিশিরেন্দু, বলল, 'কী ভাবছ সীতা।'

সীতা বলল, 'কিছু না।' মাথা তখনও নোয়ানো। ডাঁটা থেকে ছিঁড়ে শিশিরেন্দু সহজলভ্য খোঁপায় কয়েকটি ফুল গুঁজে দিল। হাত বাড়িয়ে দিতেই নাগাল পেল আরেকটি হাতের, নরম, তবু আড়ষ্ট, করতল হিম, অথচ বাধাও নেই।

বাধা নেই বলেই আগ্রহ প্রচণ্ড হয়ে উঠল, শিশিরেন্দু ঘ্রাণ নিল সেই হাতের, গ্রীবা-মূলের, কণ্ঠতটের। মুখ নোয়াতে একটি ক্ষীণ নিশ্বাস ওর চেতনায়

প্রতপ্ত প্রশ্বাস হয়ে মিশে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরে যেতে হল, ঈষদ্ভিন্ন দুটি ঝিনুক যেন আইসক্রীম-চামচ, মধুর কিন্তু মৃত্যুশীতল। তিক্ত গলায় শিশিরেন্দু বলল, 'তোমার কি প্রাণ নেই।'

ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে সীতা বলল 'আমি তো বারণ করিনি।'

শিশিরেন্দু একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। হাতের মুঠি শিথিল, স্নায়ুগুলো মই-দেয়া ফসলের মত নমিত, টিকটিক ঘড়িটার সঙ্গে সায় দিয়ে কপালের রগ টিপটিপ করছে।

গলা ভেজাতে শিশিরেন্দু এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিল, আলোটা জ্বালাই রইল, নেবাতে সাহস নেই, কেননা ঘর রুদ্ধদ্বার, ফিরে ফিরে লখিন্দরের বাসরের কথা মনে পড়েছে। অলক্ষ্য একটি সাপ লুকিয়ে আছে কোথাও, আলো নেবালেই ছোবল দেবে। মৃতমনা একটি মেয়ের সঙ্গে ওরা ওকে সারারাতের মত একটা ঘরে পুরে রেখে গেল কেন।

সীতা তখনও বসে।

শুকনো গলায় শিশিরেন্দু বলল, 'তোমার ঘুম পায়নি? নাকি, আজ সারারাত বসেই কাটাবে মতলব করেছ।'

গলাটা রূঢ়, কথা ক'টি কঠিন। মনে মনে আকৈশোর এই দিনটির যত মহলা দিয়েছে তার কোনটিতে এই সংলাপ ছিল না। কিন্তু অভিনেতাকে কখনও কখনও তো পার্ট তৈরি করে নিতে হয়।

সীতার মুখ আরও ম্লান হয়ে গেল। এক পা দু'পা করে বিছানার দিকেই বুঝি এগিয়ে আসছিল, শিশিরেন্দু বলল, 'পোষাকী জামাকাপড়গুলো ছাড়তে হবে না?'

ভীত নত মুখে সীতা বলল, 'ছেড়ে আসব?'

—'এস।' শিশিরেন্দুর নিজের কানেই কাথাটা শোনাল আদেশের মত।

আলনা থেকে আটপৌরে একটা কাপড় নিয়ে সীতা কলঘরে গেল, শিশিরেন্দু ক্ষীণ একটি জলের ধারার শব্দ শুনল কিছুক্ষণ, তারপর পালঙ্কলগ্ন সুইচটা টিপে দিতেই আলো নিবে গেল। একটু পরেই শাড়ির খসখস কানে এল, অন্ধকারে পা টিপে টিপে কে যেন বিছানার কাছে আসছে। চুড়ির একটু রিন রিন, একটু-বা আতরের গন্ধ। দু'হাত বাড়িয়ে শিশিরেন্দু তাকে টেনে নিল, সেই ঘ্রাণ, শ্রুতি, স্পর্শ কখন একাকার একটি আবেগ-মোহের রূপ নিল, নিজেও টের পেল না।

একটি সুখ-সুখ ভোরে ঘুম ভাঙবে, শিশিরেন্দু হয়ত ভেবেছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন ধড়মড় করে উঠে বসল তখনও রাত অনেকটাই বাকি। একটু আগেই দেহতটে সমুদ্র উদ্বেল হয়েছিল, এখন ঢেউ সরে গেছে, তিক্ত, শুকনো কণা কণা লবণের স্বাদ মাত্র আছে।

অথচ এই অতৃপ্তির যুক্তিমাত্র নেই। আলুলকেশ-বেশ শ্রান্ত যে-মেয়েটি এখন তারই পাশে অঘোর ঘুমে. সে তো কোন বাধা দেয়নি। বাধা না, বারণ না। শিশিরেন্দুর সব ইচ্ছায় সায় দিয়ে গেছে। তবু ক্ষোভ। তাই ক্ষোভ। এমন নিঃশব্দে কেন সব সয়ে গেল সীতা, ভুয়ো চেকে সই করে দেবার মত তার কাছে শুধু শরীরটাকেই সঁপে দিল কেন।

সমস্ত অন্তস্তল জুড়ে সূচিবিষ একটা জ্বালা, তেলহীন ফিতের মত শিরাগুলো দপ দপ করছে। অবিন্যস্ত চুলে বারবার অস্থির হাত বুলিয়েও শিশিরেন্দু সুস্থ হল না।

সীতা তখনও ঘুমে। বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল শিশিরেন্দু। জোরে জোরে ওকে ঠেলতে থাকল। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল সীতা, কিন্তু শিশিরেন্দুর চোখে চোখ পড়ে স্থির হয়ে গেল। উঠে বসল তাড়াতাড়ি, বেশবাস সংযত করে নিল। অতি মৃদু, অশ্রুতপ্রায় গলায় বলল, 'এবার আমাকে কী করতে হবে।'

সব রোষ, ক্ষোভ শুকনো পাতার মত চেতনা থেকে ঝরে গেছে, শিশিরেন্দু ব্যথিত কণ্ঠে শুধু বলতে পারল, 'তুমি কি শুধু আমি যা বলব, তাই করবে ?'

ক্লান্ত, ঈষৎ-অরুণ, অবাক চোখ দুটি মেলে সীতা বলল, 'বাঃ রে, করব না ?'

দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে কথা দুটি শিশিরেন্দুর কানে একটা বিদ্রূপের মত শোনাল। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমল কপালে, ধপ করে টেবিল-আয়নার সমুখে চোখ ঢেকে বসে পড়ল। কিন্তু তার বুঝতে বাকি নেই। বশ্যতার মুখোশ-পরা এই মেয়েটিকে চিনতে বাকি নেই। সব অভিনয়। সীতা সুখী হয়নি।

হাতের রগগুলো স্ফীত হয়ে উঠল; কঠিন আঙুলগুলো কাঁপছে। শিশিরেন্দু পারলে বুঝি হিংস্র হাতে ছিঁড়ে ফেলত প্রায়-বোবা মেয়েটির নম্রতার মুখোশ, অসহ সত্যের মুখোমুখী হত।

শিশিরেন্দু টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে নির্মম চাপ দিতে থাকল সীতার হাতে, আচ্ছন্ন কিন্তু দৃঢ় গলায় বারবার বলতে থাকল 'কে সে, কে সে সীতা, তার নাম আমাকে বলতেই হবে তোমাকে।'

যন্ত্রণায় অস্ফুট চিৎকার করে উঠল সীতা, হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে মেজেয় টলে পড়ল, নিস্তেজ রুদ্ধপ্রায় স্বরে বলল, 'কেউ না, কিছু নয়।'

কেউ না, কিছু না? শিশিরেন্দুকে ঘোর অবিশ্বাসী গলায় হেসে উঠতে শুনলুম। একটু পরেই আলো নিবল।

প্রথম বাসররাত্রি কেটে গেল।

এই পর্যন্ত লিখে কিছুদিন আর এগোতে পারিনি। শুধু উঁকি দিয়ে দেখা, চুরি করে শোনাটুকু দিয়ে, বুঝতে পেরেছি, গল্প হয় না। ফাঁকটুকু ভরতে কল্পনার যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কিছু দাঁড় করাতে হলে শক্ত ভিত্তি চাই।

ছোট বোন উমার সঙ্গে সীতার ভাব হয়েছিল। ছাত থেকে হাতছানি, আলসেয় ঝুঁকে ফিস ফিস, শাড়িতে বেঁধে বই চলাচলি থেকে মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা। টের পেয়েছি, পাশের ঘরে ওর গলা শুনেছি, কিন্তু সামনা-সামনি হইনি।

একদিন হঠাৎ এ-ঘরে এসে পড়েছিল। হয়ত ঘর ভুল করে থাকবে, কিংবা উমা বুঝি বাসায় ছিল না। চৌকাটে পা রেখেই থমকে দাঁড়াল, বলল, 'উমা—'

তাড়াতাড়ি ওর সামনে গিয়ে বললুম, 'আমি উমার দাদা।'

ও হয়ত তখুনি পিঠটান দেবে ভেবেছিল, কিন্তু পারল না। কোনমতে থতমত খেয়ে বলল, 'জানি। আপনাকে প্রায়ই দেখি। আপনি তো কখনও বাইরে যান না।'

বললাম, 'শক্ত অসুখ। ছুটি নিয়েছি। ডাক্তারের নির্দেশে এখন পরিপূর্ণ বিশ্রাম।'

শিয়রের কাছে রাখা একটা শিশি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এটা কী?'

বললুম, 'ঘুমের ওষুধ।'

বোকার মত আবার প্রশ্ন করল, 'কী ঘুম?'

হেসে বললুম, 'সব রকম ঘুম। এর এক ডোজে তন্দ্রা, দু' ডোজে নিদ্রা, চার ডোজে—একেবারে ঘুম।'

একটু শিউরে উঠল সীতা, টের পেলুম। তবু মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল। খানিক পরে আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে বইয়ের তাকের কাছে গেল। বলল, 'আপনার তো অনেক বই।'

—'হ্যাঁ, অনেক।'

—'সব পড়েছেন আপনি, না? আপনি তো লেখেন, উমার কাছে শুনেছি।'

বললুম, 'ও কিছু না। শুধু লেখার জন্যেই, কেউ পড়ে না। বাথরুমের গুনগুন যেমন নিজেকে শোনবার জন্যেই, আমার লেখাও তাই।'

অস্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে সীতা হাসল। আড়ষ্ট আরও দু'চারটে কথা বলে থাকবে, মনে নেই। কেননা, আমি আঁচলের নীচে লুকোন ওর দু'টি হাত লক্ষ্য করছিলুম। সে দু'টি কাঁপছিল। কম্প্র, কিন্তু প্রলুব্ধ আঙুলগুলো আমার চোখ এড়িয়ে বারবার ঘুমের ওষুধটা ধরতে চাইছে, কিন্তু সাহস পায়নি।

ওকে সুযোগ দিতেই বুঝি অন্যমনস্কতার ভান করেছিলুম। জানালার বাইরে, তাকিয়ে বলেছিলুম, 'আপনাদের জানালার পর্দা তো—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, কথাটা অসমাপ্ত রেখে, শোভনতার সীমা টপকে, ওর হাত চেপে ধরলুম—ওষুধের শিশিটা টক করে মাটিতে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল। সীতা থরথর করে কাঁপছিল। কালো রঙ সেই নীরক্ত মুহূর্তে অন্তত ফরসা। বললুম, 'ছিঃ।' ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। দীর্ঘ ঘোমটা টেনে ওর ত্রস্ত পায়ে পালিয়ে যাবার ছবিটুকু মনে গভীরভাবে আঁকা হয়ে গেল।

সীতা আর কোনদিন এ-বাড়ি আসেনি। কিন্তু পরদিন উমার নামে ওর হাতে-লেখা বড় একটি চিঠি এসেছিল। সে চিঠির লক্ষ্য আমি, উমা উপলক্ষ্য। সেই চিঠিরই টুকরো জোড়া দিয়ে গল্পের ফাঁকটুকু ভরেছি। আমার কাজ অনেক সোজা হয়ে গেল।

জানি টেকনিকে ত্রুটি ঘটেছে, এতদূর এসে ঘটনাস্রোতের উজানে ফিরে গেলে অলঙ্কার শাস্ত্র সায় দেবে না, পাঠকেরা বিমুখ হবেন। কিন্তু লেখাটি আমাকে শেষ করতেই হবে।

সীতা প্রথমদিন অবাক হয়েছিল ভাতের থালার পাশে দুধের বাটি দেখে। জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এ আবার কী মা ?'

মা বলেছিলেন, 'খা। শরীর ভাল হবে, চেহারায় শ্রী আসবে।'

এক চুমুকে দুধটুকু খেয়ে সীতা উঠে পড়েছিল, প্রতিবাদ করেনি। ভেবেছিল ওখানেই চুকে গেল।

যায়নি, সেটা টের পেল স্নানের আগে চুল খুলতে বসে। মা একটা লাল রঙের শিশি এগিয়ে দিলেন। সীতা শুঁকে দেখল, গন্ধ তেল। বললে, 'এ কী।'

মা বললেন, 'তোর বাবা কাল অফিস থেকে ফেরবার পথে এনেছেন। আহা, চুলগুলো উঠে যাচ্ছে, চেয়েও দেখিসনে। আজ বাদে কাল বিয়ে হবে—'

সীতা হেসে উঠল।—'বিয়ে তো হবে কিন্তু পাত্র কই।' মা চোখ বুজে মৃদু হেসে বললেন, 'আছে।'

'আছে ?' চমকে উঠল সীতা, বলল, 'কে মা ? কোথায় ?' প্রাপ্তে তু পঁচিশে মেয়ে, মার কাছে বিশেষ সঙ্কোচ নেই।

মা বললেন, 'কেন তুই জানিসনে ?' আরও অবাক হয়ে সীতা বলল, 'আমি জানব ? কী করে !'

কপট রাগের ভঙ্গি করে মা বললেন, 'বেশ ত, আমাকে বলতে না চাস, না-ই বললি। তবে আমার চোখ নেই, ভাবিসনি। তেতলার শিশির ছেলেটির সঙ্গে তোর এত মেলামেশা, তোকে বই এনে দেয়—'

'—শিশিরদরে কথা বলছ, মা ?'

ওর পিঠে হাত বুলিয়ে মা বললেন, 'লজ্জার কী। শিশির ছেলেটি খুব ভাল। তোদের দু'হাত এক হলে আমরা সুখীই হব, খুকি।'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে সীতা বলল, 'ছিঃ মা তা হবে না। শিশিরদাকে আমি দাদার মত দেখি। তা-ছাড়া'—একটু ভেবে নিয়ে সীতা বলল, 'তা-ছাড়া ও'রা বড়-লোক, মানে, বংশে টাকায় সব দিক থেকে আমাদের চেয়ে উঁচু। এ-বিয়ে কি হয় না হতে পারে !'

মা গম্ভীর গলায় বললেন, 'না হবে কেন। শেষ পর্যন্ত ওই রোগা, হ্যাংলা ক্যানভাসার সুধীর ছোঁড়ার সঙ্গেই বিয়ে হবে। চাল নেই, চুলো নেই, আমার মত সারাজীবন উপোস দেবে। শিশিরকে তোমার মনে ধরবে কেন।'

মা আঁচলে চোখ মুছলেন, সীতা জড়ো-সড়ো হয়ে বলল, 'মনে ধরার কথা তো নয়, মা। এত উঁচুতে নিচুতে কখনো মেলে না তাই বলেছিলুম।'

মা বললেন, 'ওসব তোমার মনের দোষ। দিন রাত যে বইগুলো গেলো সেই বইয়ের দোষ।'

এর পরে শিশিরেন্দুর চোখে চোখে সীতা তাকাতে পারেনি। বই নেওয়া-দেওয়া বন্ধ ছিল। তেতলার সিঁড়ি বেয়ে গটগট করে একটি যুবক নেমে গেছে, সুপুরুষ, গৌরদেহ, সুবিন্যস্ত সীঁথি। আড়াল থেকে তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছে কালো, গতশ্রী একটি মেয়ে, সঙ্কুচিত হয়ে লজ্জায় মুখ ঢেকেছে।

তবু কি মা ছেড়েছেন। বন্ধ হয়নি এক পো দুধের বরাদ্ধ, স্নানের আগে গন্ধ তেল। স্নানের পরে স্নো-পাউডারও এসেছে। গভীর বিতৃষ্ণায় সে-সব ঠেলে দিয়েছে সীতা, রুক্ষ গলায় জিজ্ঞাসা করেছে, 'কোথা থেকে এসব আসছে, মা? এদিকে তো শুনি দেনায় বাবা ডুবুডুবু, মাসকাবারের চাল-ডাল কেনার পয়সা থাকে না।'

—'সে-সব শুনে তোমার কাজ নেই।'

চুল বেঁধে, পোষাকী কাপড়খানা পরিয়ে মা ওকে সিঁড়ির মুখে দাঁড় করিয়ে দিতেন, ঠিক সন্ধ্যার মুখে-মুখে, শিশিরেন্দু যখন অফিস থেকে ফেরবার সময়। একদিন সীতা ওর বাবার সামনাসামনি পড়ে গিয়েছিল। ছাতাটা ঠুক করে একপাশে রেখে বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি রে, এখানে যে?'

সীতা পালাবার পথ পায়নি। আড়াল থেকে শুনেছিল বাবা মাকে বকছেন,—'ওকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলে কেন। ভারী বিশ্রী দেখতে। ও-ভাবে কারা দরজার পাশে দাঁড়ায় জানো?' ফিস ফিস করে বাবা একটা কথা উচ্চারণ করেছিলেন। সীতা কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, মা দপ করে জ্বলে উঠেছেন, 'তোমার যত সব খারাপ কথা। আমি পেটে ধরেছি, আমার মেয়ের ভাল আমিই সব চেয়ে ভাল বুঝি।'

সীতা সরে গিয়েছিল, মা ফের ওকে ধরে এনে শক্ত হাতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।—'এখান থেকে নড়বি না, বুঝেছিস? শিশিরের পায়ের শব্দ পেলেই নেমে যাবি সিঁড়ি দিয়ে, বই চাইবি।'

চোখ জ্বলছে কান ঝাঁ-ঝাঁ, সীতার সেদিন মান-অপমান বোধ ছিল না। উইংসের আড়ালে অভিনেত্রীর মত দাঁড়িয়েছিল শেষ পর্যন্ত। শিশিরেন্দুর জুতোর শব্দ হতে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমেও গিয়েছিল। কিন্তু চার ধাপ মাত্র। তারপরেই থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল।—'শিশিরদা, একখানা বই—'কথাটা সম্পূর্ণও করতে পারেনি।

শিশিরেন্দু একা নয়, তার পিছনে আরও একজন, সুসজ্জিতা একটি মেয়ে হয়ত সীতারই বয়সী। কিন্তু মিল যেটুকু তা ওই বয়সেই, নইলে সেই মেয়েটির দিকে তাকালে কোন মেয়েরও চোখ ফেরে না। ছোট্ট, সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল সীতা, একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ওদের পথ করে দিয়েছিল।

পর-পর আরো কয়েক দিন সেই মেয়েটি এসেছিল। অফিসের পর দু'জনে আসে, গল্প করে, হয়ত চা খায় শিশিরেন্দু ওকে এগিয়ে দিতে যায়, অনেক রাতে ফেরে।

দুধের বাটি এগিয়ে দিতে দিতে মা বলেন, 'ওদিক যে সর্বনাশ হতে চলল, এখনও চোখ বুঁজে আছিস পোড়ারমুখি।'

শুকনো গলায় সীতা বলে, 'আমি কী করব।'

মুখ বাঁকিয়ে মা বলে ওঠেন, 'তুমি কী করবে! সব করব আমি। তোর কপালে শেষ পর্যন্ত ওই হ্যাংলা ক্যানভাসারটাই আছে।'

বলতে বলতে মা আরো কাছে ঘেঁষে এলেন, পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন মেয়ের। অতি মনোরম ভঙ্গিতে বললেন, "তুই কিছু বুঝিসনে সীতা। জানিস, শিশিরের উপার্জন কত। জানিস, ও পূজোয় আমাকে একজোড়া শাড়ি প্রণামী দিয়েছে, ওর মন কত উঁচু? তোর এই দুলজোড়া তোর বাপের টাকায় কেনা ভেবেছিস? এও দিয়েছে শিশির। তোর বাবাকে দেনা শোধ করতে এক-কথায় হাজার টাকা দিয়েছে। আসছে বছর উনি রিটায়ার করবেন, তখন কি আমাদের উপোস করে বলিস সীতা।'

গায়ে কাঁটা দিয়েছিল সীতার। অস্ফুট গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'উপোস করব কেন?'

—'করব না? পেনশন নেই, কটা বা টাকা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে, তোর বিয়েতেই সব খরচ হয়ে যাবে। শিশির ছাড়া আর কে—'

কান থেকে দুলজোড়া খুলে ফেলে সীতা বলেছিল, 'আমি এসব পরতে চাইনে মা।'

'—না পরলে। মা দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছেন, কিন্তু শিশিরের মত ছেলেকে এমন ভাবে আমি হাত-ছাড়া হতে দিতে পারব না।'

মা সত্যিই সব ব্যবস্থা করলেন। সেই সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়লে এখনও সীতার হাত-পা হিম হয়ে যায়।

সারাদিন টিপ-টিপ বৃষ্টি। শরীর খারাপ বলে শিশিরেন্দু অফিসে যায়নি, বাসাতেই ছিল; মা সব খবর রেখেছিলেন। সন্ধ্যা হতেই আদা দিয়ে এক কাপ চা তৈরি করে জোর করে ওপরে পাঠিয়ে দিলেন ওকে।

ভেজান দরজা ঠেলতে গিয়ে সীতা ঠকঠক করে কাঁপছিল। অন্ধকার ঘর, শিশিরেন্দু আরাম চেয়ারে শুয়ে। চকিত প্রশ্ন করেছিল, 'কে?'

হাওয়ার ঝাপটায় দরজাটা আবার বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, ঘরের মাঝখানে সীতা দাঁড়িয়ে, হাতে থরথর এক পেয়ালা চা।

শিশিরেন্দু উঠে পেয়ালাটা নেবে, সঙ্গে সঙ্গে সবটুকু গরম চা কাৎ হয়ে পড়ল সীতার পায়ের পাতায়, 'উঃ' বলে সীতা মাটিতে বসে পড়ল, অন্ধকারে ঠোকর লাগল চেয়ারের হাতলে, কাঁচের চুড়ি মটমট করে ভেঙে গেল। স্তম্ভিত শিশিরেন্দু উঠে এসে জড়িয়ে ধরলে ওকে।

ঠিক তখুনি দরজাটা আবার খুলে গেল, হাওয়ায় নয়। হঠাৎ ঘরে আলো জ্বলে উঠল। মুখ তুলে সীতা দেখতে পেল ওর মাকে। কঠিন সেই মুখের পেশী, কিন্তু সীতা ঠোঁটের কোণে বিচিত্র একটু হাসিও যেন দেখতে পেল। নীল নিশ্চল দুটি চোখ দিয়ে মা একবার দেখলেন, চলকে-পড়া চায়ে ভিজে ওর বিস্রস্ত শাড়ির ভাঁজ, মেজেয় ছড়ান ভাঙ্গা চুড়ির টুকরো। ঠোঁটের কোণের হাসিটা স্পষ্টতর হল।

শিশিরেন্দু ওকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সীতার মা চলে যাবার ভান করে পিছন ফিরিয়েছিলেন, শিশিরেন্দু ডাকল,—'মাসিমা শুনুন। আপনি যা ভাবছেন সেসব কিছু নয়, বিশ্বাস করুন—'

সীতা দেখল ঠোঁটের কোণ থেকে প্রসারিত হয়ে অমায়িক হাসিটুকু মার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। কণ্ঠস্বরের কাঠিন্যটুকু তবু যায়নি।—'আমি যা ভাববার ঠিকই ভেবেছি। কিন্তু শিশির, এর পরে ওকে বিয়ে না করলে তো মান থাকে না।'

বিস্মিত শিশিরেন্দু বলে উঠল, 'এসব কি বলছেন মাসিমা।'

গম্ভীর গলায় সীতার মা বললেন, 'তুমি তবে বিয়ে করবে না?'

শিশিরেন্দু বলল 'সে-কথা ওঠেই না।'

'ওঠে, শিশিরেন্দু। আমরা গরিব, কিন্তু মান-মর্যাদা আছে। ভালবাসাবাসির চলন আমাদের সমাজে তো তেমন নেই, তোমাদের হয়ত আছে। এই যেমন তুমি হয়ত আরো একটি মেয়েকে ভালবাসছ।' বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে উঠল সীতার মায়ের, চোখে জল দেখা দিল, শিশিরেন্দু দু' হাত চেপে ধরে বললেন, 'আমার মেয়েকে তুমি ভালবেসেছ, তাতে আমরা কিছু মনে করিনি বাবা; কিন্তু আমাদের মান-মর্যাদা এমন করে ডুবিও না।'

মেঘের মত থমথমে শিশিরেন্দুর মুখ, ধীরে ধীরে বলল, 'হাত ছাড়ুন মাসিমা। আমি সব বুঝেছি। আপনি যা চাইছেন তাই হবে।'

জোরে জোরে পা ফেলে মা সেদিন নীচে নেমে এসেছিলেন, পিছনে মাথা নিচু করে সীতা। ঘরে এসেই লুটিয়ে পড়েছিল মার পায়ে।—'এ তুমি কি করলে মা, কেন করলে।'

পরিতৃপ্তিতে মার মুখ বিস্তৃত, মধুর গলায় বলেছেন, 'তোর ভালর জন্যেই করেছি সীতা। এতখানি বয়স হল, তোর আর বিয়ে হত ভেবেছিস? হলেও হয়ত জুটতো সেই হা-ঘরে ক্যানভাসার ছোঁড়াটা।'

অশ্রুরুদ্ধ, মৃদু গলায় সীতা বলেছে, 'কিন্তু মা, সে-ও বুঝি ভাল ছিল। আমার অনেক খুঁৎ, তারও অনেক খুঁৎ থাকত। সে আমাকে উপোস করিয়ে রাখত, আমি তার সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতাম। কিন্তু যার সামনে আমি কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না, তার সঙ্গে আমাকে কেন জন্মের মত বেঁধে দিলে।'

বিয়ের পর এক বাসায় থাকা মানাবে না, শিশিরেন্দু তাই আগে থেকেই আলাদা বাসা ঠিক করে এসেছিল। প্রতি মুহূর্তে সীতা নিজের মৃত্যু কামনা করেছে। বিজয়ীর হাসি মার মুখে, শিশিরেন্দুর টাকায় বিয়ের সাজসরঞ্জাম কিনে তিনি ঘর ভরেছেন, সীতা মরমে মরে গেছে। কেন এমন করল শিশিরেন্দু, কেন রাজি হল, কেন সেদিন লাথি দিয়ে দূর করল না কাঙালিনী ঝি আর মাকে। সে-অপমান এর চেয়ে বেশী বাজত না।

মধ্যরাত্রে মল্লিক বাড়ির সেজবাবুর ঘোড়ার ঘণ্টি বাজে, যুদ্ধবীর সিং ট্যাক্সি তোলে গ্যারেজে নিরীহ রিক্সওয়ালা চুপে চুপে তার পিছনে দাঁড়িয়ে

থাকে, দীনুবাবুর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, আট নম্বরের মাষ্টার মশাইয়ের ছেলে-মেয়েরা ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে।

বিছানায় আমি উৎকর্ণ, উন্নিদ্র অপেক্ষা করে আছি। এখুনি আলো জ্বলে উঠবে ও-পাশের ঘরে—রোজ জ্বলে। একটি লোক বিছানা থেকে নেমে পড়ে, আরেকটি মেয়ের ঘুম ভাঙায়, নরম দুটি হাত মুচড়ে দিতে দিতে বলে, 'কে সে, কে সে, সীতা, তার নাম বলতেই হবে আমাকে।'

পাংশু মুখ, আতঙ্কিত মেয়েটি হাত ছাড়িয়ে নিতে নিষ্ফল প্রয়াস পায়, নিস্তেজ স্বরে কোনমতে বলে, 'কেউ না, কিছু না, তুমি বিশ্বাস কর।'

পাগলের মত লোকটি মাথা নাড়ে, বিশ্বাস করে না। ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, 'তবে কেন আমাকে তুমি কিছু দিতে পারলে না। কিংবা সব দিয়েও এমন কিছু রেখে দিলে যাতে আমি নিজেকে আইন আদালতের পৃষ্ঠার আসামী ছাড়া কিছু ভাবতে পারিনে। কেন।'

উত্তর আসে না। টুপ করে আলোটা নিবে যায়।

আমি জানি, শিশিরেন্দু কোনদিন তার প্রশ্নের জবাব পাবে না। রাতের পর রাত সীতা একই পালার অভিনয় করে যাবে, তবু মুখ ফুটে বলতে পারবে না, শিশিরন্দু যদি রূপে গুণে, ঐশ্বর্যে, মর্যাদায় তার চেয়ে এত বেশী বড় না হত, তবে হয়ত তাকে ভালবাসতে পারত সীতা, সর্বস্ব দিতে পারত।

এও জানি সীতা বর্তমানটাই শুধু বোধ করেছে, ভয়ঙ্করতর একটা ভবিষ্যৎ আছে, সেটা সে ভেবেও দেখেনি। একদিন জীবনের অনুভূতিটাই শিশিরেন্দুর কাছে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভোঁতা হয়ে যাবে, সমতল মনে একটি মেয়ের ভালবাসা পেল কি না-পেল এই প্রশ্নটাও অর্থহীন হবে। সেদিনও যদি সীতা সইতে না পারে? চুপে চুপে এসে যদি বলে, দিন না আমাকে চার ডোজ ওষুধ, দেবেন? তখন তাকে হয়ত ফেরাতে পারব না। বিনাবাক্যে তার হাতে তুলে দেব কালো রঙের ঠাণ্ডা একটা শিশি, যার দু' ডোজে ঘুম, চার ডোজে মৃত্যু।

বিকালের দিকে এখনও যেদিন মেঘে মেঘে আকাশ কালো হয়ে আসে, নিরুপমার কাজের শেষ থাকে না। কোমরে ব্যথা, তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করতে কষ্ট, তবু কোনমতে দালানে এসে বসেন, উবু হয়েই বড়ির থালাটা সরিয়ে রাখেন এক কোণে, জোরে জোরে ডাকতে থাকেন, "বৌমা, ও বৌমা, কাপড়গুলো তুলে ফেল, এখুনি যে সব ভিজে তাল হয়ে যাবে।"

ভিতর থেকে সাড়া আসে, "যাই মা", তবু বুঝি অরুণার বেরিয়ে আসতে দু'চার মিনিট দেরি হয়। অসহিষ্ণু নিরুপমা গজগজ করেন, আবার ডাকেন, "বৌমা, তোমার চুলবাঁধা কি এখনও শেষ হল না। আজ না হয় পাতা একটু কম ঘটা করে কাটলে বাছা।"

ঠাকুমার ঝুলি

ঘরের মধ্যে অরুণা ছটফট করে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে, না পেরে বলে, "ছাড়ো, ছাড়ো, মা ডেকে ডেকে সারা হয়ে গেলেন, শুনছ না। শাড়িগুলো সব জবজবে হয়ে যাবে যে।"

অনিল বলে, "যাক। ভিজে শাড়িতেও তোমাকে নেহাত মন্দ দেখাবে না।"

"অসুখ করলে?"

"ওষুধ আছে।"

আঁচলে গাল মুছতে অরুণা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে। নিরুপমা রাগ করে বলেন, "পাতা কাটা হল।"

অরুণা অপ্রতিভ কিন্তু সহজ গলায় বলে, "মা যেন কী, কিছু দেখতে পান না। আমি কি পাতা কেটে চুল বাঁধি? জট পড়েছিল, তাই মাথায় চিরুনিটা একটু বুলিয়ে এলাম। নইলে উকুন হবে, আপনার ছেলে বলেছে।"

"নাও, এবার কাপড়গুলো তুলে ফেল দেখি। খোকা অফিস থেকে এল না? লেখাপড়া শিখে মেয়ের দিনদিন বিবেচনা যেন বাড়ছে। ঝি বিলুকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে গেছে কখন, এখনও যে আসে না।"

অরুণা বলে, "আসবে, আসবে, আপনি একটুতেই বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েন।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আর একটি শিশুর গলা শোনা যায়। ঝুপঝুপ করে তখনই বৃষ্টি নামে, রেলিংটা একেবারে ভিজে যায়, দালানেও ছাঁট আসে, নিরুপমা সরে দেয়াল ঘেঁসে বসেন। ছোট দু'টি হাত পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে, কানের কাছে নুয়ে পড়ে একটি কচি মুখ আবদার করে, "দিদা, ছড়া বল।"

"কোন্ ছড়া?"

"বিষ্টির।"

"আয় বৃষ্টি ঝেঁপে,
চাল দেব মেপে।"

"এটা না, অন্যটা। শিবঠাকুরের বিয়েটা।"

"বেশ তো, সেটাই বলছি, গলাটা তো আগে ছাড়। ফাঁস দিয়ে মারবি নাকি। ...টাপুরটুপুর নদেয় এল বান, শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান। এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান..."

"আর এক কন্যে, দিদা?"

ছড়া ভুলে দিদা তখন অন্য কথা ভাবছেন। গলিতে জল একহাঁটু হল, মেয়েটা এখনও ফেরেনি?"

লিলি এল, একেবারে ভিজে পায়রাটি হয়ে, স্যাণ্ডালের স্ট্র্যাপ ছেঁড়া, শাড়ি খাতা বই শপশপে, বিনুনি খুলে বুকের কাছে এলানো, তবু মুখে গুনগুন একটা গানের সুর।

নিরুপমা চেঁচিয়ে বললেন, "রাত দু'পহর অবধি কলেজ তোমার?"

মার সামনে লজ্জা নেই, শাড়ির প্রান্তটা একটু তুলে নিংড়ে নিল লিলি, ভিজে আঁচল দিয়েই একবার ঘষে নিল মাথা। হাসতে হাসতে বলল, "মার এখন আর সময়েরও হুঁশ নেই, রাত কোথায়, এখন তো মোটে ছ'টা। টিউটোরিয়াল ক্লাশ ছিল শেষ পিরিয়ডে, করব না?"

কঠিন স্বরে নিরুপমা বললেন, "যাও আগে জামাকাপড় ছেড়ে এস গিয়ে তারপর তোমার টিউটরিয়ালের বিহিত করছি। কলেজ থেকে ছাড়িয়ে আনলে তোমার শিক্ষা হবে।"

একটা কথাও যেন লিলির কানে গেল না, হাসতে হাসতে সে ছেঁড়া স্যাণ্ডাল জোড়া টেনে টেনে ঘরে গিয়ে ঢুকল। হাঁসের পালক জলে ভিজল না।

বিলু সরে গিয়ে হাত পেতে রেলিং ছোয়ানো জল ধরছিল, লিলি চলে যেতেই সে ছুটে এসে ভিজে হাতে দিদার গাল চেপে ধরল। 'একটা গলপো বল।"

"কী বলব, সব তো শুনেছিস, আমার ঝুলিতে আর কিছু নেই।"

"কেন বেঙ্গমাবেঙ্গমী?"

"আবার শুনতে হবে?" ফের শুরু করতে হল, "নিঝুম দুপুর, ঘোড়া ছুটিয়ে তেপান্তরের মাঠ পাড়ি দিয়ে এসেছেন রাজপুত্তুর, বটগাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছেন, চোখে ঢুলুনিও এসেছে। সেই বটগাছে বাসা বেঁধেছে বেঙ্গমাবেঙ্গমী—কাল দুপুরে কিন্তু আমার দশটা পাকা চুল তুলে দিতে হবে।"

ঝি এসে সমুখে দাঁড়াল। "কর্তাবাবু আপনাকে ডাকছেন, মা। বাতের ব্যথাটা নাকি বেড়েছে, মালিশ করে দিতে হবে।"

"বেড়েছে নাকি, বাড়বে না? যা বর্ষা নেমেছে ক'দিন থেকে। এবার ছাড় বিলু, ঘরে যাই, তোর দাদু ডাকছে।"

"তুমি দাদুকে বেশী ভালবাসো। আমি জানি।"

"না না, তোকে। হল তো। এবার সর দেখি!"

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে আসেন একেবারে ভিতরের ঘরে সেখানেও এখনও আলো জ্বলেনি। বিছানায় শোয়া একটা পাঁজরসার শরীর থেকে-থেকে খুকখুক করে কাশছে, মালিশের শিশিটা অন্ধকারেই খুঁজে নিয়ে নিরুপমা তার পাশে বসেন।

"খুব কষ্ট হচ্ছে?"

"খুব না, এই পিঠের কাছটায়। তুমি একেবারে খেয়ে এসেছ তো।"

'এখনই ? তোমার খাবার দিয়ে গেছে ?"

"আমি আজ কিছু খাব না।"

"একেবারে কিছু না সেকি হয়। একটুখানি দুধ খেতেই হবে।"

কখন আপনা থেকেই বৃষ্টি থামে, গলিতে ফের লোকজন চলাফেরার আওয়াজ পাওয়া যায়। পাশের ঘরে হৈচৈ হুল্লোড়, বোধ হয় মেজ ছেলে সুব্রত বাড়ি ফিরেছে, এতক্ষণে বাবুর দেশোদ্ধার সারা হল। ফিরেই খুনসুটি লাগিয়েছে বোন-বৌদির সঙ্গে। বড় ছেলে অনিল বুঝি ক্লাবে যায়নি, আজ অনেক রাত অবধি ওরা তাস খেলবে। এ-আসরে নিরুপমা যান না, দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেই চলে আসেন। বড়দার পার্টনার লিলি, সুব্রত বসে বৌদির সঙ্গে। তাছাড়া টুয়েন্টিনাইন খেলা নিরুপমা বোঝেনও না। আগে তাস খেলতেন বটে, কিন্তু বিন্তির ওদিকে এগোতে পারেন নি। ওদের খেলায় বাজিও আছে। যাদের কালো সেট হবে তারা শনিবার সিনেমা দেখাবে। সুব্রত যদিও এক পয়সা দেবে না, সব যাবে বৌদির বাক্স থেকে। লিলির ভরসা বড়দা।

সত্যেনবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিঃশ্বাসের তালে তালে বুক ওঠাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকছে। বিছানা থেকে উঠে নিরুপমা বাইরে এলেন। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশ এখন টলটলে, এখানে ওখানে তারাও ফুটেছে, বুটিদার একখানা নীলাম্বরী যেন ভিজে হাওয়ায় শুকোতে দেওয়া। ঝিলুরও কোন সাড়াশব্দ নেই, ঝির কোলেই না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কিনা কে জানে। আরও একটি দিন শেষ হয়ে এল।

শেষ। কথাটা যেন ধ্বনিরূপ নিয়ে বারবার বাজল নিরুপমার কানে। পিছনে চাইলেন, ঘোর অন্ধকার, একটি সুষুপ্ত মানুষের নাকের নিয়মিত ঘর্ঘর ছাড়া শব্দটুকু নেই। গায়ে কাঁটা দিল, অবলম্বনের জন্যে রেলিংটা চেপে ধরলেন। এই প্রথম নয়, আরো অনেকদিন গায়ে কাঁটা দিয়েছে, তার মধ্যে আজ বিশেষ একটি দিনের কথা মনে পড়ল। সেদিন অবশ্য কাঁটা ভয়ে দেয়নি, দিয়েছিল ভাবনায়। চল্লিশ পেরিয়ে আসার কয়েক বছর পরে সেই আষাঢ়ের রাত্রি আবার যেন ফিরে এল। সমস্ত রাত চোখের দু'পাতা এক করতে পারেননি, বিছানায় ছটফট করেছেন। আলো জেলে ক্যালেণ্ডারটা দেখছেন, ফের আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছেন, কিন্তু ঘুমোননি। হিসাব

যদি নির্ভুল হয়, আর মনে যে ভাবনা ঢুকেছে তা যদি ঠিক হয়, তবে ছি ছি, সকলের কাছে মুখ দেখাবেন কী করে। এক ছেলের বিয়ে দিয়েছেন, আরেক ছেলেও বড়, কলেজে পড়ে, মেয়ে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে, আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে একটি দুটি পাকা চুল প্রায়ই খুঁজে পান, কী লজ্জা।

পরদিন সকালে তাঁর চেহারা দেখে সকলে অবাক হয়ে গেছে। রুক্ষ মূর্তি, সারা কপালে সিঁদুর লেপা, চোখের কোলে কালি। বাথরুমে ঘটিঘটি জল ঢেলেও যেন সে-কালি মোছেনি, অকারণে মেয়েকে মেরেছেন, ঝিকে ধমকেছেন, বৌকে ঠেস দিয়ে কথা শুনিয়েছেন। আসল রাগ যার উপরে, নাকে প্রাণ খুলে গাল পাড়লে সব জ্বালা জুড়োত, সে তখন টুরে, মফঃস্বলে। তার করলে লোক-জানাজানি হবে, তাই পত্রপাঠ চলে আসতে গোপনে চিঠি লিখে দিলেন।

সত্যেনবাবু চার দিনের মাথায় ফিরে এলেন।

প্রথমেই মেয়ের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞাসা করলেন, "কার অসুখ রে।"

"কই, কারো তো না।"

"তবে যে তোর মা আমাকে তাড়াতাড়ি আসতে লিখে দিলে। কত কাজ ফেলে আমাকে চলে আসতে হয়েছে ভাব দেখি।"

লিলি চোখ বড় করে বলেছিল, "মা তোমাকে চিঠি দিয়েছিল বুঝি বাবা? কই, আমাদের তো কিছু জানায়নি?"

বোঝার উপর শাকের আঁটির মত ভাবনার উপর লজ্জা চাপল। কাণ্ডজ্ঞান-হীন লোকটা আরও কী বেফাঁস কথা বলে ফেলে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি কড়া গলায় বললেন, "লিলি, তুই কাজে যা। তুমি এদিকে একবার এসো তো।"

সব শুনে সত্যেনবাবুরও মুখ শুকিয়ে গেল। ভাঙাভাঙা গলায় বললেন, "তুমি ঠিক জানো, তোমার ভুল হয়নি?"

পূর্ণিমার নিশিপালন, একাদশীর জো, কোনো তিথির হিসাবে এতটুকু যার গোলেমাল হয় না, তার এতবড় ব্যাপারটায় ভুল হবে? চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে, দাঁতে ঠোঁট চেপে নিরুপমা বললেন, "ভুল হলে তো বেঁচে যেতাম, কিন্তু আমার আর একটুও সন্দেহ নেই যে।"

"তাই তো," বলে মাথা চুলকে সত্যেনবাবু সেখানে থেকে সরে পড়লেন।

রাত্রে দেখা হতে ফের বললেন, "তবে তো একজন ডাক্তার এনে ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নিতে হয়।"

"যেমন বিবেচনা তেমন কথা!" পাশ ফিরে নিরুপমা বললেন, "বৌ, মেয়ে, ছেলেদের সামনে সবাই জিজ্ঞাসা করবে কী হয়েছে। আমি মরে গেলেও নয়।"

"তবে তুমিই একবার চেম্বারে চল।"

"হাঙ্গামা তাতেও কম নয়। কোথায় যাচ্ছি বলে বেরোব? কেউ যদি সঙ্গে যেতে চায় তা হলে?"

আরও একটা উপায় স্থির। সবাইকে বলবেন কালীঘাটে পুজো দিতে যাচ্ছেন। কালীঘাটের নামে লিলি নাক সিঁটকাল, বৌ ঠোঁট বাঁকাল। কেউ সঙ্গ নিল না।

কালো পর্দাটানা, চড়া আলো জ্বালানো ডাক্তারখানার সেই ছোট কামরাটির কথা মনে পড়লে আজও শরীর শিউরে ওঠে। কত জেরা, নির্লজ্জ, কণ্টকিত মিনিটের পর মিনিট আর যেন কাটে না। তালু অবধি জিভ শুকিয়ে গেল, কলিজার গতি কি এত দ্রুত, হাতুড়ি কি এর চেয়েও জোরে পড়ে। এত নোনা জল কি থাকে মানুষের দেহে, নইলে এই ঘাম কোথা থেকে এল।

পরীক্ষার পর ডাক্তার বলেছেন, "আপনি এখানেই একটু বসুন, আমি আপনার স্বামীর সঙ্গে একটা দু'টো কথা বলে আসি।"

পর্দা টানাই রইল, তবু উৎকর্ণ নিরুপমা এপাশে দাঁড়িয়ে ওপাশের কথা পরিষ্কার শুনতে পেলেন। ডাক্তারবাবুর গলা: যত সব বাজে ভয় আপনাদের আরে না না মশায়, ওসব কিছু না, আমি খুব যত্ন নিয়েই পরীক্ষা করেছি। কত বয়স হল আপনার মিসেসের,......আই সী। সিসটেম আদারওয়াইজ ভালো? তবে তো আমি যা ভেবেছি তাই......। এখানে ডাক্তারবাবু বুঝি গলা নামিয়ে মুখটা সত্যেনবাবুর কানের একেবারে কাছে নিয়ে গেলেন একেবারে শেষের দু'টি কথা মোটে নিরুপমার কানে এল: "যান মশাই, আর কোনো ভয়ই নেই আপনাদের, একেবারে নিরঙ্কুশ। তবে জীবনের একটা পরিচ্ছেদ ফুরিয়ে এসেছে, মনে রাখবেন, এটা তারই সূচনা।"

ফেরবার পথে ট্যাক্সিতে বসে উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করলেন সত্যেনবাবু। "দেখলে তো, মিছিমিছি আমাকে কী বকাটাই না বকলে, কী হয়রানটাই না করালে। মফস্বল থেকে সব কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে হল, তারপর কালীঘাটের নাম করে ডাক্তারের বাড়ি," হো হো করে হাসছিলেন সত্যেনবাবু, হাসতে হাসতেই বলছিলেন, "এবার সত্যিই কিন্তু একদিন গঙ্গাচ্চান করতে হবে, কালীঘাটে পূজো দিতে হবে। দেখছ না গিন্নী, এতদিনে আমরা বুড়ো হতে চললাম। এখন ক'বছর গঙ্গায় নাওয়া আর তিলক কাটা চলুক, তারপর দু'জনে মিলে কাশীবাসী হওয়া যাবে।"

সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে, সত্যেনবাবু তখনও হাসছিলেন, নিরুপমা হঠাৎ তীব্র গলায় ধমক দিয়ে উঠলেন, "চুপ করো।"

সত্যেনবাবু অবাক হয়েছিলেন, অপ্রস্তুত ভাব সামলে উঠতেই ফের হেসে নিচু স্বরে বলেছিলেন, "তবে এখন কিছুদিনের জন্যে কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত, ডাক্তার বলল শোননি?"

"তুমি চুপ করলে!" এবার এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন নিরুপমা যে, ড্রাইভার চমকে ফিরে চাইল, সত্যেনবাবু বাকী পথটা আর একটা কথাও বলতে ভরসা পেলেন না।

'আর ভয় নেই'—ডাক্তারের এই আশ্বাস তারপর থেকে কতবার যে নিরুপমা নিজেকে অস্ফুট স্বরে শুনিয়েছেন ইয়ত্তা নেই। আশ্চর্য, মন খুশিতে নেচে ওঠেনি। দুপুরে সবাই ঘুমোলে ছোট একটা হাত-আয়না নিয়ে বসেছেন, দেখে দেখে খুঁটে খুঁটে পাকা চুল তুলছেন, ওপর ওপর কালোর নীচে এত সাদা চুল লুকিয়ে ছিল? মুখের চামড়া এখানে ওখানে টেনে টেনে দেখেছেন, এই দাগটা কোথা থেকে এল, আগে তো ছিল না। কপালের এই রেখা? নাকি ভুল দেখেছেন, চোখ দু'টিও তাঁর গেছে। একে একে সব যাবে, চোখ যাবে কান যাবে, একদিন বলার ক্ষমতাও। মৃত্যু এগিয়ে আসছে ধীর পায়ে, এরা সব তার চর। তারই প্রথম পরোয়ানা পৌঁছে গেছে দেহে। একটি অধ্যায় শেষ হয়ে এসেছে, ডাক্তার বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথা বলল কেন, আর ভয় নেই? কী নিষ্ঠুর ঠাট্টা।

একটি সুখের চিরতরে ইতি হতে চলেছে, সব সুখেরই একে একে ইতি হবে। ছোট ছোট মৃত্যুর বিন্দু দিয়ে একটি সম্পূর্ণ অবসানের সরসী

তৈরি হবে। সেই সরসীতে যতদিন ডুবে মরতে না পারেছেন তত দিন কী করবেন নিরুপমা। পলিত-কেশ, গলিতনখদন্ত হয়ে বেঁচে থাকবেন? আর ভয় নেই, কী মিথ্যুক ডাক্তার। ভয় তো এখনই বেশী। সেদিনের আর দেরি নেই, যখন নিরুপমা নিজেকে আয়নায় দেখে ভয় পাবেন, চিনতে চাইবেন না বা পারবেন না।

হাত-আয়নাটার কাঁচ ঝাপসা হয়ে এল, চমকে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে মুছে নিলেন নিরুপমা, ফোঁটা ফোঁটা জলে কখন ভিজে গেছে, একটুও টের পায়নি? বিশ্বাস একটা অনুভূতি সারা শরীর তিতো করে দিয়েছে। হায়রে, এর চেয়ে সেই ভাবনাটা সত্য হল না কেন। লিলিতে চৌদ্দ বছর আগে যার ইতি হয়ে গেছে, এতদিন পরে পুনশ্চ দিয়ে ফের সেটার সুরু হলে লজ্জা পেতেন ঠিক। কিন্তু জীবনের এখনও পরমায়ু আছে এই আশ্বাসও পেতেন। লজ্জা তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নয়। হাতের মুঠি শক্ত হল নিরুপমার, ঝুঁকে পড়ে শক্ত কাচে কপালটা ঘসতে ঘসতে বারবার প্রার্থনা করলেন, ডাক্তারের পরীক্ষা যেন ভুল হয়, যে-ভয় করেছিলেন সেটাই যেন সত্যি হয়ে ওঠে।

কেমন যেন হয়ে গেলেন নিরুপমা। নিজেও টের পেতেন বদলে যাচ্ছেন। একা একাই কখন চোখের পাতা ভিজে গেছে, কখন ফিক ফিক করে হেসেছেন। ঘুমের ঘোরে কতবার যে মুখ নখের টানে ক্ষত করেছেন হিসাব নেই। ছেলেরা বলত মা, তোমার কি কোন অসুখ করেছে। মাথা নেড়ে নিরুপমা বলতেন, না না। এত জোরদিয়ে বলতেন যে, যারা শুনত তারা চমকে উঠত।

আর বকতেন লিলিকে। ভাল লাগত না অরুণাকেও, কিন্তু সে পরের মেয়ে, বেশী কিছু বলতে ভরসা পেতেন না। লিলি যেন দু' চোখের বিষ হয়েছিল। এমন করে চুল বেঁধেছিস কেন, এই শাড়িটা পরলি কেন, জামার হাতা ছোট করে কেন ছাঁটলি—ছুতোর কখনও অভাব হত না। আবার, লিলি তাঁর পাশেই তো শুত, কেন কোন দিন রাত্রে উঠে তাকে অপলক চোখে দেখতেন নিরুপমা। একটি শরীর ধীরে ধীরে ভরে উঠছে, একটি মেয়ে দিনে দিনে সুন্দর হয়ে উঠছে দেখেও যেন তৃপ্তি হত না, ওর গায়ে হাত দিয়ে পরিপূর্ণ একটি বুকের শ্বাসপতনের ছন্দ অনুভব করতে চাইতেন। কোন দিন হয়ত লিলি জেগে উঠেছে, মাকে নির্নিমেষ

চোখে চেয়ে থাকতে দেখে ভয় পেয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে, "কী মা কী।"

"কিছু না", নিরুপমা বলেছেন, "তুই ঘুমো।"

সেই সময়ে কিছু দিনের জন্যে লিলিকে কি হিংসে করতে শুরু করেছিলেন নিরুপমা, আপন মেয়েকে ? কে জানে।

তাস খেলা ফেলে ওরা এখন দল বেঁধে খেতে আসছে, নিরুপমা টের পেলেন। তাড়াতাড়ি সরে গেলেন এক কোণে। আজ আর তিনি কিছু খাবেন না, কেমন একটা চোঁয়া ঢেকুর উটছে বিকাল থেকে। সত্যেন-বাবুর জন্যে শুধু একটু গরম দুধ দিয়ে যেতে বলে দেবেন ঝিকে।

মনে নেই কবে সেই পাগলামির ভাবটা কেটে গেছে, সন্ধি করেছেন নিজের সঙ্গে। ভেবেছিলেন সম্মুখে গলি, গলির শেষে দু' হাত প্রসারিত করে মৃত্যু দাঁড়িয়ে, কাছে গেলেই টেনে নেবে। এগিয়ে দেখছেন গলি বন্ধ নয়, ওখানে মাত্র একটা বাঁক, মোড় ফিরতেই আরেকটা দিগন্ত খুলে গেছে। ঠিক করে জীবনের নূতন অর্থ খুঁজে পেলেন খেয়াল নেই, অরুণা যেদিন কলতলায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল, সেদিন থেকেই কি। ছেলেরা ডাক্তার ডাকতে ছুটল, সত্যেনবাবু অস্থির হয়ে পায়চারি শুরু করলেন, কিন্তু নিরুপমা ঘাবড়াননি। তাঁর অভিজ্ঞ চোখ ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা কী। অরুণাকে ধরে ধরে আনলেন কলতলা থেকে, বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মুখ চোখ মুছিয়ে দিয়ে সন্তর্পণে জেরা করে জানলেন, যা অনুমান করেছেন তা-ই ঠিক। একটা দাঁত পড়ে গেছে, তবু ফোকলা মাড়ি বের করে হাসতে আটকাল না। বহুদিন পরে সেই প্রথম।

নিরুপমা সেদিন থেকেই কাঁথা শেলাইকরতে আরম্ভ করলেন। একটা নূতন কাজ জুটল।

আরেকটা কাজ বাড়ল আরও বছরখানেক বাদে, যেদিন সত্যেনবাবু মফস্বল থেকে বাতে প্রায় পঙ্গু হয়ে ফিরে এসে শয্যা নিলেন। মেয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার পড়া, অরুণা কোলের ছেলে বিলুকে সামলাতেই হিমসিম, নিরুপমার নিজেরও শরীর ভালো না, তবু মালিশের শিশির হাতে তাঁকে সত্যেনবাবুর বিছানার পাশে গিয়ে বসতে হল।

সেই শয্যা, কিন্তু নতুন সম্পর্ক। তাঁকে নাওয়ানো, সময়মত আহার জোগানো,—একাভাবে তাঁরই উপর নির্ভরশীল অসহায় অসমর্থ মানুষটিকে নতুনভাবে ভালবাসতে শুরু করলেন। ছেলেদের পিতৃ-ভক্তি তখন

দায়িত্ব পালনের নামান্তরমাত্র, তরুণী মেয়ে প্রহরে প্রহরে পোশাক-বদলেই মশগুল। হঠাৎ যেন নিরুপমা টের পেলেন তিনি ছাড়া স্বামীর আপন জন কেউ নেই। তাঁরই কি আর কেউ আছে। আশ্চর্য, দুঃখ হল না, কান্না এল না।

তারপর বিলু একটু একটু করে বড় হয়েছে, মুখে একটি দু'টি করে কথা ফুটেছে, চলতে শিখছে; শুনে, দেখে নিজেই যেন খুশিতে শিশু হয়ে গেছেন নিরুপমা। সবাইকে ডেকে দেখিয়েছেন তার মাতালের মত টলতে টলতে চলা, ধপাস করে পড়া। কেঁদে উঠলে কোলে তুলে থামিয়েছেন। আধো আধো বুলি শুনে হাততালি দিয়ে হেসেছেন। ভুলে যাওয়া ছড়াগুলো ফের মুখস্ত করতে হয়েছে, বিলুকে শোনাবেন। উপন্যাস পড়া ফেলে আরেকবার পড়ে নিয়েছেন ঠাকুরমার ঝুলি।

"মা এখনও এখানে দাঁড়িয়ে? খাওয়া হয়ে গেছে?"

ছেলেরা উপরে উঠে এসেছে। নিরুপমা বললেন, "আজ কিছু খাব না রে, শরীর ভালো নেই। ঝিকে বলে দে তো, বিলুকে আমার কাছে দিয়ে যাক। আজ বাদলার দিন, বিছানা ভেজাবে, ঠাসঠাস মার খেয়ে সারারাত চেঁচাবে, ওর মায়ের যা মেজাজ। বিলু আমার কাছেই শোবে।"

ঘরে ফিরে গিয়ে নিরুপমা মেঝেয় বিছানা করে নিলেন। ঝি প্রথমে সত্যেনবাবুর জন্যে দুধ, পরে বিলুকে শুইয়ে দিয়ে গেল। খানিক পরে লিলিও এসে গড়িয়ে পড়ল আরেক পাশে। নিরুপমা ধমক দিয়ে বললেন, "জামাটা আলগা কার শো, গরম মরে যাবি যে।"

কুন্ঠিত লিলি ঘুমের ঘোরেই জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "না, না, আমার অসুবিধে হবে না।"

"আহা, মার কাছেও মেয়ের লজ্জা," বলে নিরুপমা আরেকবার ধমক দিলেন, কিন্তু আর পীড়াপীড়ি করলেন না।

জেগে উঠে দুধটুকু খেয়ে সত্যেনবাবু আবার শুয়ে পড়েছিলেন, নিরুপমা মৃদু-স্বরে বললেন, "এখন কেমন আছ। ব্যথাটা কমেছে?"

"পায়ের কাছটাতে কনকন করছে এখনও," সত্যেনবাবু ককিয়ে ককিয়ে বললেন, "একটু টিপে দেবে?"

নিজের চোখ ঘুমে ভরে এসেছিল, তবু মালিশের শিশি নিয়ে নিরুপমাকে উঠতে হল। সত্যেনবাবুর পায়ের কাছটিতে গিয়ে বসলেন। একটু পরেই ডেকে উঠে নাক ঘুমের গভীরতা ঘোষণা করল।

হঠাৎ নিরুপমা টের পেলেন, বিলু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। স্বপ্ন দেখেছে হয়ত। তাড়াতাড়ি উঠে তার পাশে গিয়ে বসলেন। মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে থাবড়াতে থাকলেন, "ঘুম আয়, ঘুম আয়, নিম গাছের পাতা। দুই দুয়োরে পড়ে আছে দুটো বাঘের মাথা।" জড়িতস্বরে বিলু বললে, "এটা না, তিন কন্যেটা।"

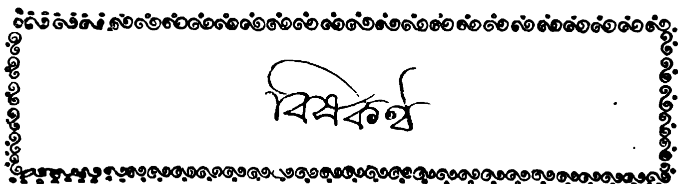
"বেশ তবে তিন কন্যেটাই শোন।" নিরুপমা ফের শুরু করলেন, "......তিন কন্যে দান। এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান। আরেক কন্যে——"

চোখ ঢুলুঢুলু অবসাদে শরীর ভারী, বিলুর ছোট মাথাটিকেও কোলে রাখতে পারছেন না। এত ক্লান্তি, তবু কী এক আশ্চর্য সুখের স্বাদ যেন দেহের কণায় কণায় ছড়িয়ে গিয়ে এখন সত্তাকেও ছেয়ে ফেলেছে। একটি সুখের ইতি হয়ে গেল বলে নিরুপমা একদিন কেঁদেছিলেন, তখনও এই সুখের ঠিকানা জানতেন না। সেদিন বোঝেননি, সারার পরেও সুরু আছে। যৌবনকেই একদা জীবন বলে ভুল করেছিলেন, এখন জেনেছেন জীবন যৌবনকে ছাড়িয়েও।

সারা রাস্তা শুভেন্দুর অস্বস্তিতে কেটেছে। অভ্যর্থনা না-জানি কেমন হবে। দেড়বছরের পুরোনো জামাই। তবু বিয়ের পর এই প্রথম।

কিন্তু না শাঁখ না উলু। মোটঘাট নামতে হল নিজেকেই। কোঁচার খুটে কপালের ঘাম মুছছে, চকিতের জন্যে দেখা গেল শাশুড়িকে! কিন্তু তিনি সামনে এলেন না, চট করে আড়ালে চলে গেলেন, বোধ হয় ছেঁড়া শাড়িটা ঘুরিয়ে পরতে।

বিধবা শালা-বৌ সুহাস এল তার পর। শুকনো মুখ, রুক্ষ চুল, অল্প হেসে বললে, একটু ব'স ভাই চা করে আনি। আসলে কিন্তু ঢুকলে গিয়ে কলঘরে। মুখটা হয়ত ঘসে নেবে ভিজে গামছায়, চুলে একবারটি চিরুনী বুলিয়ে নেবে।



ছোট শালি মিনি একটা জলচৌকি এনে দিলে, সতীর তখনও দেখা নেই।

'তোমার দিদি কোথায়', শুভেন্দু নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলে।

'আছে, আছে, বাপরে, কী ব্যস্ত।' বড় শালি কণিকা—এখানে যে ফ্রক পরে—চোখ ঘুরিয়ে বললে। হাত-পাখা নিয়ে কণি দাঁড়িয়েছে গা ঘেঁষে, শুভেন্দু জড়ো-সড়ো হয়ে গেল। এত বড় হয়েছে মেয়েটা, তবু লজ্জা নেই। হোক না জামাইবাবু, পুরুষ তো। ভাল করে খেতে-পরতে পায় না, শরীরের পুষ্টি নেই, কিন্তু ফ্রকে আর পোষ মানে না। মাথা নীচু করল শুভেন্দু, ঘামছিল, এবার নাইতে সুরু করল।

আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'পাখাটা আমাকে দাও।'

পায়ের নখগুলো কী বিশ্রী বড় হয়েছে কণির, কতদিন কাটে না, কে জানে। হাঁটু গোড়ালি অবধি ধুলো, মাঝে মাঝে কবেকার চর্মরোগের চাকা চাকা কালো দাগ। ঘৃণায় মনের ভেতরটা দড়ি-পাকান হয়ে গেছে। 'পাখাটা আমাকে দাও', শুভেন্দু আবার বললে। কণি ছাড়ল না, টানাটানিতে শুভেন্দুর একটা আঙুল ছড়ে গেল।

অস্ফুট স্বরে শুভেন্দু বললে, 'উঃ। দুফোটা রক্ত জমেছিল, কণি মুখ নামিয়ে আনে।—'দিনএ শুষে নিচ্ছি। এখুনি রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।'

গায়ে কাঁটা দিল শুভেন্দুর। রক্তশুদ্ধ হাতটা পকেটে পুরে দিয়েও স্বস্তি হল না। শাদা পাঞ্জাবীটার একাংশে লাল ছোপ লাগল, ভ্রূক্ষেপ করল না।

'তোমার দিদিকে ডেকে দাও' শুভেন্দু বললে মরিয়া হয়ে।

'দিদি এখন আসবে না', কণি আস্তে আস্তে বললে, 'দিদি ছাদে বসে কাঁদছে।'

'কাঁদছে ? কেন ?'

ফিস ফিস করে বললে, 'রোজ কাঁদে যে। আমি জানি। দু'একদিন পরে বাচ্ছা হবে কিনা, তাই।'

'বাচ্ছা হবে বলে কাঁদে!' বিমূঢ় গলায় শুভেন্দু বলল, যেন কণি দুর্বোধ্য কোন ভাষায় কথা বলছে, সবটুকু মানে হৃদয়ঙ্গম হয়নি।

'কাঁদে। দিদি ভীষণ ভয় পেয়েছে যে! বলছে বাচ্ছাটা বাঁচবে না। বাঁচবে না কেন জামাইবাবু ?'

ঠিক তখনি শাশুড়ি ঢুকলেন ঘরে। শুভেন্দু প্রণাম করবে বলে মাথা নোয়ালে। মৃণালিনী পা ছুঁতে দিলেন না, দু-পা সরে দাঁড়ালেন, শুভেন্দুর মাথায় রাখবেন বলে ডান হাত বাড়ালেন, শেষ পর্যন্ত ছুঁলেন না, আশীর্বাদের একটা ভঙ্গি করলেন মাত্র। শুভেন্দু ততক্ষণ দস্তা-রূপো মেশান দুটো কাঁচা টাকা রেখেছে মেজেয়, প্রণামী। শাশুড়ি চেয়ে দেখলেন, ইতস্তত করলেন এক মুহূর্ত, তারপর নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিলেন টাকা দুটো, আঁচলে বাঁধলেন। এ-শাড়িটা আগেকারটার চেয়ে হয়ত একটু ফরসা, কিন্তু এটাও এখানে ওখানে ছেঁড়া।

মামুলি দু-একটা কথা হল, মৃণালিনী বললেন, 'যাই রান্নার বন্দোবস্ত দেখিগে।' শুভেন্দু টের পেল, চৌকাঠের ওপাশে গিয়ে তিনি চোখের ইশারায় ডাকলেন মিনিকে, আঁচলে-বাঁধা টাকা দুটোর একটি দিলেন মেয়ের হাতে।

—'মোড়ের দোকান থেকে চার আনার মিষ্টি নিয়ে আয়।'

—'মোটে চার আনার মা ? আমাদের জন্যে কিছু আনব না ?'

দ্রুত কঠিন একটা চড়ের শব্দে আবদারের বাকিটুকু চাপা পড়ে গেল।

চায়ের কাপ নিয়ে এল সুহাস, একটু পরে মিনিও ফিরল মিষ্টি নিয়ে।

কড়া পাকের সন্দেশ, শুভেন্দু ভেঙে ভেঙে মুখে পুরলে; দু-একবার গলায় ঠেকে গেল, চায়ের রসে ভিজিয়ে নিলে। শূন্য ঠোঙাটা মিনি লেহন করছে জিভ্ দিয়ে, আর কণি—হাত-পাখা নিয়ে সে, তখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে—লোলুপ দুটো চোখ নিয়ে। শুভেন্দু বার বার বিষম খেল, চা চলকে পড়ে জামাটা এখানে ওখানে ভিজে গেল।

'সতী কেমন আছে' মৃণালিনীকে সসঙ্কোচে একবার জিজ্ঞাসা করল।

'ভালই তো।' মৃণালিনী অন্য দিকে চেয়ে জবাব দিলেন।

'ভয়ের কিছু নেই ত।'

'ভয় ? না ভয় কিসের ?' মৃণালিনী বললেন, কিন্তু স্বরে তেমন আশ্বাস ফুটল না।

'ডাক্তার নিয়মিত দেখছে তো।' প্রশ্নটা নিজের কানেই কর্কশ প্রায়-অভদ্র শোনাল, কিন্তু মুখের কথা হল হাতের তীর, ফেরান যায় না। শুভেন্দু তাড়াতাড়ি জুড়ে দিল, 'এই প্রথমবার কি না ?'

'প্রথমবার ?' অস্ফুট কণ্ঠে মৃণালিনী কথাটার পুনরুক্তি করলেন, একটু শিউরেও উঠলেন হয়ত, শুভেন্দুর চোখে ধরা পড়ল না।

কতকটা স্বগত, কতকটা নিজেকে সান্ত্বনা দিতে, শুভেন্দু বললে, 'ভয়ের কী আছে। এখানে আপনার কাছেই তো আছে। যত্ন হচ্ছে।'

'যত্ন এখানে!' শুভেন্দুর কথা থেকেই দুটো শব্দ বেছে নিয়ে মৃণালিনী উত্তর দিলেন, কিন্তু তাতেই সব বলা হয়ে গেল। 'যত্ন, এখানে।"

আলাপের নড়বড়ে সাঁকোটা কেঁপে গেল, শুভেন্দু হাত বাড়িয়েও আরেকটা খুঁটীর নাগাল পেলনা।

রান্নার যোগাড় দেখতে মৃণালিনী একটু পরে উঠে গেলেন, তার পরও শুভেন্দু চুপচাপ বসে রইল। বেলা ফুরিয়ে এসেছে, ঘরের ভিতরটা এখন অন্ধকার-অন্ধকার। একটা মাকড়শা কখন থেকে দেয়াল থেকে দেয়ালে নিঃশব্দ পায়ে ঘুরছে, জাল পাতার উপযুক্ত জায়গাটি না পেয়ে এখন একদৃষ্টে দেখছে শুভেন্দুকে। দিনের শেষ ভনভন মাছিটি এখনও

অদৃশ্য হয়নি, এরই মধ্যে হঠাৎ কোথা থেকে উঠে এসেছে এককাঁকে মশা, গুনগুন শুরু করেছে।

মিনি পান নিয়ে এল। শুভেন্দু বললে, 'খাই না।'

'তবে সিগারেট জামাইবাবু? এনে দিই দোকান থেকে?'

'তাও না।' কোন রকম নেশা শুভেন্দুর নেই।

ফিক করে হেসে মিনি বললে, 'একটি ছাড়া। দিদিকে ছাড়া আপনার চলে না, না জামাইবাবু?'

শুভেন্দু মনে মনে বলল, পাকা মেয়ে। মুখে বলল, 'কে বললে। এই তো দিব্যি আছি।'

ঘাড় বাঁকিয়ে মিনি বললে, 'ইস্, তা বইকি। দিদিকে দেখলে সাধুসন্ন্যাসীরই মন টলে যায়; তো আপনি! প্রতুলদাও বলতেন—'

'প্রতুলদা কে?' শুভেন্দু ভাঙা ভাঙা গলায় প্রশ্ন করল।

গালে তর্জনী রেখে মিনি বলল, 'ও-মা, জানে না? প্রতুলদা তো প্রায় রোজই—সেই দিদির বিয়ের আগে থেকেই—'

কথাটা শেষ হল না। কখন স্থহাস বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল, নির্বাক চোখের কঠিন ইশারায় বাইরে টেনে নিয়ে গেল মিনিকে।

তখনও সতীর দেখা নেই। ছাদের কোনটিতে একলা বসে কান্না কি শেষ হয়নি।

শুধু বসে থেকে থেকে শুভেন্দু ক্লান্ত হয়ে উঠল। মশা তাড়াল একটা, হাই তুলল কয়েকবার, তারপর এক সময় নিজে থেকেই চোখ দুটো জড়িয়ে এল। ঘামে পাঞ্জাবীটা ভিজে উঠেছে, বিশেষ করে ঘাড়ের কাছে, ছড়ে-যাওয়া আঙুলটা টনটন করছে এতক্ষণ পরে, কণ্ঠার ঠিক নীচেই একটা ঘামাচিকে ঘিরে কয়েকটা মশা ভোজে বসেছে। ঘুম হল না, এক গ্লাস জল পেলে বড় ভাল হত।

উঠে বারান্দার দিকে যাবে, কিন্তু চৌকাঠের বাইরে পা দেওয়া হল না। দরজার বাইরেই দীর্ঘ দুটি ছায়া, সে দুটিকে সনাক্ত করতেই শুভেন্দু বুঝি একবার বাইরে উ'কি দিল। বারান্দার কোণে, দেয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে দাঁড়িয়ে আছে স্থহাস, দ্বিতীয় জনকেও চিনতে শুভেন্দুর দেরি হল না। সতী।

'কী হবে, কী হবে, ভাই ঠাকুরঝি। আমার যে ভারি লজ্জা করছে। প্রতুল চৌধুরীর আসবার সময় যে প্রায় হয়ে এল।'

সুহাসের কণ্ঠ।

সতীর জবাবও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল। মৃদু গলা, ক্লান্ত, একটু বা শুকনো। —'আমাকে কি করতে হবে।'

'শুভেন্দুবাবু এমন হঠাৎ এসে পড়েছেন, তাই। উনি কী ভাববেন ঠাকুরঝি? ওর কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না। তুমি প্রতুল চৌধুরী এলে ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আজকের মত ফেরৎ পাঠিও তো ভাই।'

'লজ্জা আমারও আছে বৌদি। প্রতুল চৌধুরীর কাছে এ-শরীরটা দেখাতে পারব না।' সতীর গলা তেমনি শুকনো, ক্লান্ত, কিন্তু দৃঢ়তর।

'প্রতুল চৌধুরীকে শরীর দেখাতে লজ্জা, তোমার ঠাকুরঝি?' কী বিষ ছিল সুহাসের গলায়, সতী ছিটকে সরে এল এ-পাশে, একেবারে শুভেন্দুর মুখোমুখি।

'সতী, শোন।' শুভেন্দু ধীরকণ্ঠে বললে।

সতী মুখ তুললে। জল-টলটল নীল দুটি চামচ। এক-পা, দু-পা করে ঢুকল ঘরে। নিস্তেজ, চাপা স্বরে বলল, 'কী।'

'প্রতুল চৌধুরী কে, সতী।'

ঠিক তখনই বাইরে কড়া নড়ে উঠল। ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে নয়, একটানা। আগন্তুকের নিশ্চিত বিশ্বাস প্রবেশাধিকার সে পাবেই।

'যাও, দরজাটা খুলে দিয়ে এস।'

'না, না, আমি না', আকুল কণ্ঠে সতী বলে উঠল; 'তুমি যাও' তোমার দুটি পায়ে পড়ি।'

বিস্ময় ফুটল শুভেন্দুর চোখে; তারপর ঠোঁট দুটি বিদ্রূপে বেঁকে গেল। —'বেশ, তবে আমিই যাই।'

যেতে হল না, দরজা ইতিমধ্যেই খুলে দিয়েছে সুহাস, যাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে, তার রোমশ মণিবন্ধের ঘড়িটি শুধু দেখা যায়।

'পথ ছাড় সুহাস।'

'আজ না। তোমার দুটিপায়ে পড়ি, তুমি আজ চলে যাও প্রতুল।"

আধো অন্ধকারে একটা দেশলাই জ্বলে উঠল, ক্ষণপরে সিগারেটের ধোঁয়ায় দুটি মানুষ নিমেষের জন্যে আড়াল হয়ে গেল। একটু পরেই

তাদের আবার যখন দেখা গেল—একজনের কব্জিলগ্ন ঘড়ি, আরেকজনের খোলা ঘোমটা মাথার আলগা খোঁপা—তখন প্রতুল চৌধুরী বলছে, 'তবে তুমি চল।'

'কোথায় ?'

'ভয় নেই। ঠিক সময়েই ফিরিয়ে দিয়ে যাব। ওরা বাইরে ট্যাক্সিতে বসে আছে সুহাস, একা ফিরে গেলে আমার উপায় থাকবে না।'

'চল।' একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করল সুহাস, কাপড়টা ওখানে দাঁড়িয়েই ঠিকঠাক করে নিল। 'চল।'

—'এই বেশেই ? জুতোও পরবে না ?'

—'কাজ কী।' সুহাসের স্বরে একটা হিম হাসির আভাস পাওয়া গেল শুধু। 'আমি আর দাঁড়াতে পারছি না প্রতুল, পা কাঁপছে। তাড়াতাড়ি চল।'

দরজার কাছে ন যযৌ ন তস্থৌ শুভেন্দু একটা গাড়ির দরজা খোলার, স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শুনলে ; গাড়িটা পিছনে যে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া রেখে গেল, তার আঘ্রাণ নিলে বুকে ভরে। তারপর ফিরে তাকাল।

ঘরের মধ্যে জানালার শিক ধরে সতী আতঙ্কপাণ্ডুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

এসবের অর্থ কী সতী, শুভেন্দু চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে গেল, কিন্তু শুধু বিকৃত একটা স্বর বেরল, কণ্ঠনালীর কাছে গোটা কয়েক শিরা উঁচু হয়ে উঠল।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝুপ করে সতী মাটিতে বসে পড়েছে, রুক্ষ চুলের ভার পিঠময় ছড়ান, অবিন্যস্ত বেশ। শুভেন্দু চেয়ে দেখল, তারপর আস্তে আস্তে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল।

সতী পলকে কুড়িয়ে নিল আঁচল, দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ।'

ফিরে যাচ্ছি। শুভেন্দু অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে বললে।

'ফিরে যাচ্ছ ?' সতী অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'এই রাত্রে ?' এখন তো ট্রেন নেই।'

'স্টেশনে কাটাব। এখানে আমার আর এক মুহূর্ত থাকা চলে না সতী।'

'কেন ?'

নির্লজ্জের মত সতী যে এত কিছুর পরও এ প্রশ্নটা করতে পারে শুভেন্দু আশঙ্কা করেনি। মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল, তারপর বলল, 'এ কেনর উত্তর তোমার যদি জানা না থাকে সতী, তবে তোমার বৌদি হাওয়া খেয়ে ফিরলে জিজ্ঞাসা কর।'

জিনিসপত্র সব গোছানই ছিল, স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে শুভেন্দু দরজার বাইরে পা দিলে। টলতে টলতে সতী এগিয়ে এল, শুভেন্দুর হাত দুটি ধরে অসহায় গলায় বলে উঠল, 'না তুমি যেতে পারবে না।'

হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল শুভেন্দু, পারল না। কপালে অল্প অল্প ঘাম দেখা দিল, কিছু রোষে, কিছু ক্ষোভে, কিছু উত্তেজনায়।

'ছাড়।' নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে একত্র গ্রথিত করে শুভেন্দু গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

'না, না, না।'—হাত দুটো ছেড়ে পা জড়িয়ে ধরল সতী, নিমেষের জন্যে শুভেন্দু দেহে বিদ্যুৎ-দাহ বোধ করল। মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই বিতৃষ্ণা গলা অবধি উঠে এল, অন্ধপ্রায় শুভেন্দু কী করল খেয়াল ছিল না, সম্বিৎ ফিরে এলে দেখল সতী লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। দেহ নিথর, চোখ দুটি অপলক, দৃষ্টি-হীন।

শুভেন্দু ঝুঁকে পড়ল, হাঁটু ভেঙ্গে বসল পাশে, এখনও ওর পায়ের পাতার ওপর সতীর শিথিল দুটি হাতের মিনতি। ক্ষীণশ্বাস দেহটি সহসা প্রবল একটা আক্ষেপে কুঞ্চিত হয়ে উঠল, একটু একটু গোঙানি শোনা যেতে লাগল।

'সতী।' শুভেন্দু ডাকল সাহস করে।

সাড়া এল না। বড় বড় দুটি কাল চোখ বিস্ফারিত করে সতী চেয়ে আছে। সে-চোখে তিরস্কার না ঘৃণা, পড়বার সাধ্য শুভেন্দুর নেই। অনেক পরে সতীর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, ক্ষীণ, প্রায়-অশ্রুত গলায় বলল, 'মাকে ডেকে দাও। তুমি যাও।'

মৃণালিনী, কণি, মিনি সবাই বারান্দার কোণেই বুঝি ছিল ভীড় করে। ইঙ্গিতমাত্রে ভিতরে ছুটে এল। মৃণালিনী মেয়ের মাথা কোলে তুলে নিলেন, কণি নিয়ে এল হাত পাখা, মিনি জল আনতে ছুটল।

একবার শুধু শুভেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে মৃণালিনী বললেন, 'পাশের বাড়িতেই ডাক্তার। একবার ডেকে দেবে।'

স্যাটকেসটা আর তুলে নেওয়া হল না। অন্ধকার প্যাসেজ পেরিয়ে শুভেন্দু ডাক্তারের খোঁজে সদর রাস্তায় বেরল।

ডাক্তার এসেই দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন ভিতর থেকে। বললেন, 'আপনি বাইরে থাকুন।' সামান্য হেসে বললেন, 'এ সময়ে স্বামীকে ভিতরে যেতে নেই।'

শুভেন্দু কিছুক্ষণ পড়া-না-বোঝা ছাত্রের মত অবোধ চোখে চেয়ে রইল। তারপর ভাঙাভঙা স্বরে বলল, 'সে কী। এত শীগগির।'

ডাক্তার বললেন, 'বেশি প্রিমেচিওর তো নয়। তবে হঠাৎ কোন শক পেয়ে পেইনটা বোধ হয় নির্দিষ্ট দিনটির কিছু আগেই শুরু হয়েছে।'

সারা রাত শুভেন্দু বারান্দায় পায়চারী করেছে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়া মাথায় লাগতে দাঁড়িয়েছে সদর রাস্তায়। চোখ ঘুমে ভরে এসেছে, অনেক দূরের একটা বাড়ি থেকে রাত-পাখির কর্কশ আওয়াজ, দেয়ালের টিকিটিকিটার থেকে থেকে শব্দ, বারান্দার কোণে রাখা বেতের সাজিটার ভিতর ইঁদুরগুলোর কিচিরমিচির, কল চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার টুপটাপ, রাত্রের বিচিত্র সব শব্দের সঙ্গে ভেজানো ঘরের ভিতর থেকে একটি মেয়ের অবিরাম গোঙানি এক হয়ে মিশে গেছে।

সদর দরজায় পিঠ দিয়ে শুভেন্দু দাঁড়িয়েছিল। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু হয়ে এসেছে, হঠাৎ টের পেল সন্তর্পণে কে যেন কবাট দুটি ঠেলছে। সরে দাঁড়াতেই দরজা ফাঁক হয়ে গেল, মাথা নীচু করে সুহাস ঢুকল ভিতরে। শুভেন্দুকে দেখে যেন চমকে গেল।—'আপনি! এখানে?'

শুভেন্দু সেই অন্ধকারেও সুহাসের মুখখানা দেখতে চেষ্টা করছিল। কোন উত্তর দিল না।

সুহাস আবার মৃদু গলায় বলল, 'সতী ঠাকুরঝি—'

শুভেন্দু তর্জনী তুলে ভেজান দরজাটা দেখিয়ে দিল। কোন কথা হল না।

শেষ রাতে ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

—'কী হল ডাক্তারবাবু?'

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে ডাক্তার বললেন, 'বলছি। আপনি আমার সঙ্গে একবার ক্লিনিকে আসবেন।'

শুভেন্দু পিছে পিছে এল। ডাক্তার প্রথম হাত ধুয়ে নিলেন বেসিনে। চোখে-মুখে জল দিলেন, জানালা খুলে দিয়ে সকালের প্রথম আলোর দীর্ঘ একটি জ্যোতির্ময় রেখাকে ডেকে আনলেন ভিতরে।

দুঃসংবাদ আছে শুভেন্দুবাবু। ইংরিজী একটা খবরের কাগজ হকার কখন কবাটের নিচে দিয়ে গলিয়ে রেখে গেছে, বড় বড় হেড লাইনে নানা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রথম পাতায় সাজান, সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে শুভেন্দু অর্থোদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করছিল, ডাক্তারের গম্ভীর কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল। দুঃসংবাদ আছে।

টেবিলে রাখা হাতের পাতায় চোখ দুটি নিবদ্ধ রেখে শুভেন্দু আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'সতী কি বেঁচে নেই?'

'আছে।'

'তবে কি বাচ্ছাটা—'

'সেও আছে।' ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু জন্মান্ধ হয়েছে শুভেন্দুবাবু।'

'জন্মান্ধ?' শুভেন্দূ যান্ত্রিক কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করল।

'জন্মান্ধ।' ডাক্তার আবার বললেন। 'আপনাকে গোটা কয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন। আমি ডাক্তার, সঙ্কোচের কারণ নেই।'

একটির পর একটি প্রশ্ন। ডাক্তার শুভেন্দুর কানে যেন গরম সীসে ফোঁটা ফোঁটা করে ঢালছেন। কোনটার কী উত্তর দিলে ঠিক নেই, টলতে টলতে ক্লিনিক থেকে যখন বেরিয়ে এল, তখন জমাটবাঁধা ধাতুপিণ্ডের মত চেতনা যেন অসাড় হয়ে গেছে।

কিছু বাকি নেই। ডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিয়েছেন, ভিতরে গিয়ে পরীক্ষা করেছেন। বলেছেন, 'ডিটেলড রিপোর্ট এখন দিতে পারছি না শুভেন্দুবাবু, কিন্তু প্রিলিমিনারী ইম্প্রেসন থেকে আপনাকে বলছি সাবধান হোন।' একটু থেমে বিচিত্র কঠিন কণ্ঠে বলেছেন, 'যতদূর বুঝতে পারছি, লজ্জাকর রোগের কীট আপনার রক্তে ছেয়ে গেছে।'

'আমার রক্তে, ডাক্তারবাবু? আমার? অসহায় শিশুর মত শুভেন্দু চেঁচিয়ে উঠেছে,—এ কী করে সম্ভব হল ডাক্তারবাবু, কী করে।' উদ্‌ভ্রান্ত আবিল দৃষ্টি শুভেন্দুর, নিশিজাগর-রক্তিম দুটি চোখ। বলতে বলতে সেই চোখে দু'ফোঁটা জল দেখা দিল, আকুল, রুদ্ধপ্রায় গলায় শুভেন্দু

বলে উঠল, 'বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু, কোন দুর্নীতি আমাকে স্পর্শ করেনি। বাবা ছিলেন পণ্ডিত, ছেলেবেলা থেকে তাঁর কড়া শাসনে থেকেছি; মদ দূরে থাক, সিগারেট, নস্যি কখনও ছুঁইনি, একটা সুপুরী পর্যন্ত দাঁতে কাটিনি। মেয়েদের দিকে সমস্ত জীবন মুখ তুলে পর্যন্ত তাকাইনি, কাছে যাইনি, সে প্রবৃত্তিই হয়নি, এ-সর্বনাশ আমার কেন হল ডাক্তারবাবু, কেমন করে হল।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে ডাক্তার শুনেছেন, একাগ্র হতে হাতের সিগারেটটা নিবিয়েছেন, পরে আবার একটা ধরিয়েছেন, সেটা ছাইদানীতেই নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, খেয়াল করেননি। শেষে উঠে এসে শুভেন্দুর পিঠে আশ্বাসের ভঙ্গীতে হাত রেখেছেন। আই পিটি ইউ, ইয়ংমান। আমি জানি, কেন। জীবনে আপনি দোষ না করে থাকতে পারেন, কিন্তু ভুল করেছেন। বিয়ের আগে আপনার যথেষ্ট খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত ছিল।'

আর কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না। তপ্তরক্ত ছুঁচের মত কথাটা বিঁধেছিল শুভেন্দুর মর্মে। তবু ডাক্তার বলেছিলেন।

'প্রফেসান্যাল সিক্রেট। তবু আপনাকে খুলে বলা কর্তব্য মনে করি শুভেন্দু-বাবু। তিন বছর আগে আরও একবার এমনি কল পেয়ে, ও-বাড়ি আমাকে যেতে হয়েছিল।'

'কী হল সেই শিশু?' শুভেন্দু নিস্তেজ মৃঢ় গলায় জিজ্ঞাসা করল।—'জন্মান্ধ?'

'না। সেটি ক্ষীণজীবি হয়েই জন্মে-ছিল। 'ক ঘণ্টা পরেই মারা যায়। তখনই আমার আসল কথাটা বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু অপ্রিয় সত্য আমাদের সজ্ঞান চিন্তার পাশ কাটিয়ে যায়।'

হাই তুলে ডাক্তার চোখের পাতা দুটি ক্ষণিকের জন্য বন্ধ করলেন, সেই অবসরে শুভেন্দু বেরিয়ে এল পথে। কোন দিকে যাবে।

শুভেন্দু জানে কোন দিকে। হাতের মুঠি কঠিন, কপালের শিরা স্ফীত। একটু পরেই টুঁটি টিপে ধরবে সতীর, তারপর বিকলাঙ্গ জন্মান্ধ শিশুটিরও ইহলীলা সাঙ্গ করে দেবে।

কড়া কড়কড় করে উঠল। দরজা খুলে দিয়ে সুহাস ভয়ে সরে দাঁড়াল একপাশে। জুতোর ঠোকরে একটা কাঁসার গ্লাস ঝনঝন শব্দে ছিটকে পড়ল উঠোনে; প্রতিধ্বনি দেওয়াল থেকে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরল।

সতী চমকে তাকাল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরে আঁচল দিয়ে ঢেকে দিল নিজের মুখ, কোলের শিশুটিকে।

মূহূর্তের জন্যে শুভেন্দু স্তব্ধ হয়ে গেল। আঁচলের নিচে মাঝে মাঝে ছোট ছোট হাত-পা নড়ে উঠলো, মাঝে মাঝে চুক চুক শব্দ, থেমে থেমে ট্যাঁ ট্যাঁ কান্না।

একটু পরেই থেমে যাবে এ-কান্না আর আঁচলের আড়ালে প্রসব-অবসন্ন যে শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে, সেটা একেবারে নিস্পন্দ হয়ে যাবে। সব শেষ।

সেই মূহূর্তে একটা টিকটিকি পোকা ধরার উল্লাসে টকটক করে উঠল, জানলার ফাঁক দিয়ে দুটো বোলতা ঘরে ঢুকে শুভেন্দুর কানের কাছে শুরু করল গুঞ্জন। হঠাৎ হাতের মুঠি শিথিল হয়ে গেল শুভেন্দুর। সব শেষ? সব না তো। তার রক্তময় ছড়িয়ে আছে অগণিত পাপকণিকা, দুটি অপঘাত মৃত্যু দিয়েও তো তাদের নিঃশেষে মুছে ফেলা যাবে না। ভাবতে ভাবতে মাথাটা টলে উঠল, শুভেন্দুর আরক্তিম, আবিল দুটি চোখ তপ্ত নির্ঝরের মত জল ঝরতে লাগল। সতীর বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে শুভেন্দু কেবলি বলতে থাকল, 'তুমি আমার এ-সর্বনাশ কেন করলে সতী, কেন করলে।'

সতী নড়ল না, মুখ ফেরাল না, আঁচলের নীচে থেকে শুধু অতি শ্রান্ত একটি নিয়মিত প্রশ্বাসের আভাস পাওয়া গেল, মাঝে মাঝে ট্যাঁ-ট্যাঁ কেঁদে উঠে একটি নবজাত তার জন্মান্ধতার বিরুদ্ধে নালিশ জানাল।

ধীরে ধীরে উঠল শুভেন্দু। দরজার কোণে স্যুটকেসটা তখন থেকে পড়ে আছে; তালাটা আছে হাঁ করে। সেটাকে খুলে জিনিষপত্র গুছিয়ে শুভেন্দু ফের ভরতে লাগল।

—'একটা কথা শুনবেন?'

শুভেন্দু তাকিয়ে দেখল সুহাস।

জিনিষ গোছান হয়ে গিয়েছিল, শুভেন্দু স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুহাস ওকে ডেকে নিয়ে গেল বারান্দার কোণটিতে। মিনি আর কণি খেলনা নিয়ে বসেছিল, তারা ত্রস্ত হয়ে এক ধারে সরে বসল। মৃণালিনী একবার উঁকি দিয়ে ফের কলঘরে লুকোলেন।

'কী বলবেন।'

সুহাস মাথায় সামান্য ঘোমটা টেনে দিল, আঁচলটা গুছিয়ে নিল গায়ে নত চোখে ধীরে স্বরে বলল, 'সতী ঠাকুরঝি আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়নি শুভেন্দুবাবু আমি দেব।'

অসহিষ্ণু গলায় শুভেন্দু বলে উঠল, 'জবাব আমি চাই না বৌঠান, আমার সব জানা হয়ে গেছে। সতীর ব্যাপারটা সব ডাক্তারবাবুর কাছে শুনেছি, আর'—একটু ইতস্তত করে বলল, 'আর আপনাকে তো কালই দেখেছি।'

'দেখেছেন। শুনেছেন।' সুহাস আস্তে আস্তে শব্দ দুটির পুনরুক্তি করল। 'কিন্তু দেখা-শোনার পরেও একটা জিনিস বাকি থাকে, বোঝা। আপনি আমাদের কথা বোঝেননি শুভেন্দুবাবু।'

'বুঝে লাভ নেই। আমার সর্বনাশ যা হবার, হয়েছে। সমস্ত কৈশোর, প্রথম যৌবন নিজেকে সব সুখ থেকে বঞ্চিত করে রুদ্ধপ্রায় ঘরে থাকার পুরস্কার তো পেলাম। এই রোগ। আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর পথ নেই সুহাস বৌঠান।'

'আত্মহত্যা?' দেখতে দেখতে হিংস্র হয়ে উঠল সুহাসের দুটি চোখ, ঘোমটা খসে পড়ল। 'আত্মহত্যা আমরা করিনি, শুভেন্দুবাবু? উনি, সতীর দাদা, হঠাৎ যখন মারা গেলেন, এখন আমাদের স্বজন নেই, সহায় নেই। একটা ভাড়া বাড়িতে বুড়ি শাশুড়ি, কমবয়সী বিধবা বৌ, বয়স্থা ননদ, আর দুটি কিশোরী মেয়ের কী খেয়ে কী পরে দিন কেটেছে অনুমান করতে পারেন? হাঁড়িতে একটা চাল নেই, অথচ প্রতিদিন একটার পর একটা কুৎসিত উড়ো চিঠি এসেছে, জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে পাড়ার ছেলেরা দিয়েছে শিষ। রাত্রে উঠোনে ঢিল পড়েছে। অন্ধকার ঘরে কাঠ হয়ে শুয়ে আমরা প্রতি রাত্রে ভেবেছি কখন ভোর হবে। আবার ভোর হলে ভেবেছি এখনি অন্ধকার নেমে এসে আমাদের সব লজ্জা ঘুচিয়ে দিক। লেখাপড়া বেশি শিখিনি, তবু চাকরীর চেষ্টায় ননদ-ভাজ মিলে শহরের পথে পথে ঘুরেছি; ইতর, অশ্লীল ঠাট্টা ছাড়া কিছু জোটেনি। হাতে তৈরী ছোটখাট জিনিস ফিরি করতে বেরিয়েছি, কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েরাই আমাদের ঠকিয়েছে বেশি, ঠিকমত দাম দেয়নি। ততদিনে শেষ ভরি সোনাও বিকিয়ে কাঁসার বাসনে হাত পড়েছে। ঠিক এই সময় এগিয়ে এল প্রতুল চৌধুরী আমাদের বাঁচাতে, মারতে।'

'প্রতুল চৌধুরীই কি সতীকে—'শুভেন্দু স্তম্ভিতভাবে জিজ্ঞাসা করল।

সুহাস বলল, 'হাঁ।' তারপর দীর্ঘ একটা যতি দিয়ে বলল, 'ওর বয়স ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, প্রতুল চৌধুরী সতী ঠাকুরঝিকে বেছে নিয়েছিল। একদিন আপনি এলেন বাঁচল সতী। এবারে এগিয়ে যেতে হল আমাকে।' আবার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সুহাস, অবসন্ন কণ্ঠে বলল, 'আমারও শরীরে কীট ধরেছে সুভেন্দুবাবু। বেশিদিন আর টানতে পারব না।' বলতে বলতে যন্ত্রণায় সুহাসের মুখ বিকৃত হয়ে গেল, কণির মাথায় হাত রেখে বলল, 'আমার পরে আসবে কণি, আসতেই হবে। সব প্রতুল চৌধুরীর নোট বইয়ে নম্বর-টোকা হয়ে গেছে। কণিরও এই রোগ হবে। ওর পরে হয়ত আসবে মিনি।'

দ্রুত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে গেল, 'আপনি তো পালিয়ে বাঁচবেন শুভেন্দুবাবু, কিন্তু আমরা যাব কোথায়। প্রতুল চৌধুরী তো সংসারে একজনই নয়। এই রোগ তারা দিয়েছে আমাকে, সতীকে, আপনাকে। কণিকে মিনিকেও দেবে। কারো রেহাই নেই। এরোগ আমাদের সকলের শুভেন্দুবাবু, আর শুধু শরীরেই নয়।'

সুহাস একটু দম নিল, তারপর শুভেন্দুর হাত দুটি চেপে গাঢ় কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে সেরে উঠতেই হবে শুভেন্দুবাবু, আমাদের সবাইকে সারিয়ে তুলতে হবে।'

সেই স্পর্শে শুভেন্দুর গায়ে কাঁটা দিল। সুহাসের অনুনয়-স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে চেয়ে মুখ ফেরাতে পারল না। আস্তে আস্তে স্যুটকেসটা মাটিতে নামিয়ে রাখল।

সম্পাদক মহাশয় মাননীয়েষু,

সবিনয় নিবেদন, মাস কয়েক হ'ল ডাকযোগে একটি গল্প পাঠিয়েছিলুম। সেটি মনোতীত হয়েছে ব'লে খবরও দিয়েছিলেন। তারপর অনেক দিন গেল, লেখাটি এ সংখ্যাতেও ছাপা হয় নি দেখলুম।

যাই হোক, আমার তাগাদা সেজন্যে নয়। ছাপা হয় নি, সেটা বরং শাপে বর। গল্পটি যদি ছাপাখানায় না পাঠিয়ে থাকেন তবে আমাকে ফেরত পাঠালে বাধিত হব। কেননা শেষের দিকটা ফিরে লিখতে হবে। ছাপা হয়ে গিয়ে থাকলে ফর্মার শেষ পৃষ্ঠাটা নষ্ট ক'রে ফেলুন।

এই অসঙ্গত আবদারে আপনি, অনুমান করি, বিব্রত বোধ করছেন। আমার কথা রাখতে গেলে কিছু আর্থিক লোকসান তো হবেই, কাগজ-

লেখকের চিঠি

প্রকাশের দিনটিও পিছিয়ে যেতে পারে। বিশ্বাস করুন, নেহাত দায়ে না ঠেকলে এমন অন্যায় প্রস্তাব করতুম না।

গল্পটি আগাগোড়া বানানো হ'ল কোন কথা ছিল না। ঠেকে গেছি সত্য ঘটনাকে সাহিত্য করতে গিয়ে। এ কাজে আমার বন্ধু কল্যাণবাবু নিপুণ, চেনা লোককে নিয়ে লেখার অভ্যাস তাঁকে সুনাম দুই-ই দিয়েছে। জানতাম যার কর্ম তারে সাজে, তাই মাঝে মাঝে লোভ হ'লেও কখনও তাঁর পথ ধরি নি।

কিন্তু দেখুন তো, নীতিবাক্যটি ভুলে গিয়ে কি বিপদেই পড়েছি! আর ভুলেছিলুম তো ভুলেছিলুম, হতভাগা লোকটার সঙ্গে ফের দেখা হতে গেল কেন! লেখাটা একবার ছাপা হয়ে গেলে আর চারা ছিল না। ওকে বোঝাতে পারতুম, হাতের ঢিল একবার ফস্‌কে গেলে, ইত্যাদি।

ঠিক ক'রে বলুন তো, লেখাটা আপনি পড়েছিলেন কি না! চেনা লেখক, আমার ধারণা, নাম দেখেই ওটা মনোনীত মার্কা ফাইলে তুলে

রেখেছেন, সুবিধামত ছাপবেন ভাবছেন। কোথায় অসুবিধে ঘটেছে আপনাকে খুলে বলি। ফাইল থেকে রচনাটি যদি বের ক'রে সামনে নিয়ে বসতেন, সব চেয়ে ভাল হ'ত। যাই হোক, গল্পটি ফের সংক্ষেপে লিখে দিচ্ছি, চোখ বুলিয়ে গেলেই বুঝবেন, কোন্‌খানটা বদলাতে চাই এবং কেন।

আগেই কবুল করেছি, এটা আমার লেখা গল্প। অধুনা যেখানে আছি সেটা যদিও প্রবাস, তবু এর পাত্রপাত্রী বাঙালী, কারণ আমার বাসা আসলে একটা বাঙালী ব্যারাকে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, বাঙালী লেখক প্রবাসেও স্বজন নিয়ে কাহিনী বোনে।

এই প্রবাসে চমকপ্রদ কিছু ঘটে না, বা ঘটলেও আমার চোখে পড়ে না। খোঁড়া পা'র মত দিনগুলোকে কোন মতে টেনে টেনে চলি। তাই প্রতিবেশী সুধীরবাবুর বদলি হয়ে যাওয়ার মত সামান্য ব্যাপার নিয়েও এখানে কম আলোচনা হয় নি। প্রথমে আলোচনা, পরে কানাকানি হাসাহাসি। আমার গল্পের গোড়ার দিকে এ সবের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কৌতূহল হ'লে অংশটুকু প'ড়ে নেবেন।

কিন্তু অত কষ্ট কেনই বা করবেন? গল্পটির মোটামুটি কাঠামো ফের তো লিখতেই বসেছি। সুধীরবাবু মধ্যবয়সী, জীবনে দু কুড়ির ওপর কোন্ না ছ-সাতটি বসন্ত দেখেছেন। কিন্তু সুদর্শন। বিশেষণটি মনে রাখবেন। দীর্ঘ পাতলা দেহ, পাক-ধরা চুল এখনও রীতিমত ঘন, টেরিযোগ্য, বেশবাশে অসামান্য রুচি। খুব কম প্রৌঢ়ের চোখে মুখে এতটা শ্রী দেখেছি। সাহিত্য সঙ্গীত ইত্যাদিতেও অনুরাগ আছে। তরুণবয়সে কিঞ্চিৎ কাব্যচর্চাও করতেন মনে হয়।

গল্পের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখবেন, সুধীরবাবুর স্ত্রীকে মাত্র রূপবতী বলেছি। সংযমের কারণ নেহাৎ ব্যক্তিগত। বলা যায় না, ছাপা হ'লে আমার গৃহিণী লেখাটা পড়তেও পারতেন। পরস্ত্রী নিয়ে সাত কাহন লিখতে ভরসা পাই নি। এ চিঠি গোপনে আপনাকে লিখছি, তাই জানাতে বাধা নেই, উল্লিখিত মহিলা গৌরাঙ্গী, সুকেশ, তিলফুল-নাসা। দেহের গড়নও ভাল, তবে ঝোঁক ঈষৎ পৃথুলতার দিকে। এবার আপনি যা জানতে চাইবেন জানি,—ভদ্রমহিলার বয়স। সুধীরবাবুর বয়সটা অনায়াসে লিখতে পেরেছি, তাঁর স্ত্রীরটা পারব না। মেয়েদের ও-বস্তুটি, জানেন

তো, অনেক প্রলেপের লেপমুড়ি দিয়ে থাকে। প্রথম দেখে আমার মনে হয়েছিল, শী ইজ থার্টি ইফ এ ডে; আমার স্ত্রী বলেছিলেন চল্লিশ; সুতরাং গড়পড়তার অঙ্কে ফেলে ধ'রে নিতে পারেন পঁয়ত্রিশ। তা ছাড়া পরে জেনেছি, ওঁর বড় মেয়েটি কিশোরী; আরও পরে, ওঁর এক পাটি দাঁত বাঁধানো। অবশ্য বয়সের বিচারে এসব কিছুই প্রমাণ করে না। ধ'রে নিতে পারেন, এটা সেই ভাঁটা-লাগার কাল, যখন গ্ল্যামার হয়তো কিছুটা থাকে, কিন্তু নবীনতা আদৌ না। পুরুষের এ বয়সে দরকার হয় চশমা এবং হজমী গুলির, মেয়েদের ঘড়ি ঘড়ি প্রসাধনের ঝুলির।

বাজে কথা ঢের হ'ল, এবার আসল গল্পে ফিরে আসি।

বদলি হয়ে সুধীরবাবু বিশেষ অসুবিধায় পড়েছিলেন। যেখানে ওঁকে পাঠানো হ'ল, সেখানে সস্তায় বাসাভাড়া পাওয়া যায় না। ছেলেমেয়েরা এখানে পড়ছে, সেশনের মাঝামাঝি, লটবহর তুলে পালানো কি সোজা! অগত্যা ঠিক হ'ল, সুধীরবাবু নতুন জায়গায় একাই যাবেন, হোটেলে থেকে চাকরি করবেন। সমস্যা তাতেও কম নয়, কেন না, আয় সামান্য, দুজায়গার খরচ পোষানো একরকম অসম্ভব। তবু যেতে হ'ল। আমাদের উপর অনুরোধ রইল, অভিভাবকহীন পরিবারটির দিকে যেন নজর রাখি।

মুশকিলে পড়লুম এই নজর রাখতে গিয়ে। নইলে অজ্ঞাতকুলশীল কে এক পরিমলবাবু কোথায় এসে উঠেছেন, কী করছেন, এত খবর আমার জানবার কথা নয়।

আমার স্ত্রী একদিন বললেন, মৃণালদির ভাবনা ঘুচল।

গল্পটি পড়া থাকলে আপনাকে ব'লে দিতে হ'ত না, মৃণাল সুধীরবাবুর স্ত্রীর নাম। শুনলুম, সুধীরবাবুর বাসায় অতিথি এসেছেন। ওঁদেরই পুরনো বন্ধু, বড় চাকুরে, পরিমলবাবু নানা দেশে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এখানে এসে পড়েছেন। পরিমলবাবুর মা এবং গৃহিণীও কাছাকাছি কোন এক তীর্থে আছেন, তাঁরাও এসে পড়লেন ব'লে। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে কলকাতা যাবেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, সবাই যাবে কেন?

বারে, পরিমলবাবুকে মৃণালদি ওঁদের অসুবিধার কথা সব খুলে বলেছেন যে। সুধীরবাবুর যা আয় তাতে দু জায়গায় খরচ কুলোয় না শুনে পরিমলবাবু বলেছেন, কলকাতায় ওঁর একটা বাসা একরকম খালি

প'ড়ে আছে, সেখানে বিনা ভাড়ায় এরা থাকতে পারবে। মিড সেশনে ছেলেমেয়েদের ট্রান্সফারেরও কোন অসুবিধা হবে না, সে ব্যবস্থা পরিমল-বাবুই করবেন। সম্পাদক মহাশয়, এক দিন আমার স্ত্রী কত খবর সংগ্রহ করেছেন দেখুন, সাধে কি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে মেয়েদের এত কদর! সব শুনে পরিমলবাবুকে বিধিপ্রেরিত পুরুষ ব'লে মনে হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম, ওঁরা কবে যাবেন?

মৃণালদি বলেছেন, সপ্তাহখানেক। কলকাতায় খালি বাসাটার কলি ফেরাতে হবে। এর মধ্যে ওঁরা সকলে একবার সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসবেন। সুধীরবাবুর ছুটি নেই, নিজে আসতে পারবেন না।

স্ত্রী বললেন, তোমার কি মনে হয়।

সম্রাট মহানুভব।

স্ত্রী বললেন, এতদিনে মৃণালদির মুখে হাসি ফুটেছে। জান, এ কদিন উনি শুধু লুকিয়ে কেঁদেছেন?

বললুম, কী ক'রে জানব? জানলেও তোমার কাছে সে কথা কি কবুল করতে ভরসা পেতুম?

স্ত্রী কটাক্ষ হেনে (এখনও মাঝে মাঝে হানেন) বললেন, তোমার সবটাতেই ইয়ার্কি। ওঁরা সত্যি খুব বেঁচে গেলেন, না? এই দুর্দিনে বাসা ভাড়া বেঁচে যাওয়া, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত—

ক্রমে ক্রমে পরিমলবাবুর আরও নানা গুণের কথা কানে এল। আমার সূত্র অবশ্য ওই একটিই। শুনলুম, সম্রাট শুধু মহানুভব নন, সম্রাট কবিও। মুখে মুখে ছড়া তৈরি করেন। প্রশ্ন করেছিলুম, যথা?

মৃণালদি ওঁর বউদি তো, ঠাট্টার সম্পর্ক। এই তো সেদিন শুনলুম, ওঁকে ডাকছেন 'যেমন আছে তেমনি এসো আর ক'রো না সাজ... বেণী না হয় এলিয়ে রবে, সিঁথি না হয় বাঁকা হবে···' আরও কত কী!

চমকে বললুম, এ তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

স্ত্রীও কিছু অপ্রতিভ হলেন।—তাই নাকি? তবে যে মৃণালদি বললেন, উনি নিজেই কবিতা বানান!

বললুম, আমার কোন ভাই বানিয়েও তোমাকে এ ভাষায় ডাকলে আমি কিন্তু খুশি হতুম না।

চ'টে গিয়ে স্ত্রী বললেন, যাচ্ছেতাই সব লিখে লিখে তোমার মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। কবি না হন ভদ্রলোক খুব রসিক। তোমার মত সব সময় মুখ হাঁড়ি ক'রে ব'সে থাকেন না। মৃণালদি যখন রান্না করেন উনি তখন পাশে মোড়া নিয়ে ব'সে মজার মজার সব গল্প বলেন, জান?

জানি, সম্পাদক মশাই, এই অবধি প'ড়ে আপনি মুখ টিপে হাসছেন, মনে মনে বলছেন, বুঝেছি। আসল মুসকিল কোথায় জানেন? গল্প-উপন্যাসে একটা জিনিষ যত সহজে বোঝা যায়, প্রকৃত জীবনে যায় না। ডিটেকটিভ বইয়ের গোয়েন্দা কত সহজে খুনীকে ধ'রে ফেলেন, অথচ সত্যিকার পুলিস সামান্য একটা চুরির কিনারা করতে হিমসিম খেয়ে যায়। অনেক গল্প-বাছাই-করা আপনার অভিজ্ঞ চোখ, অনেক-গল্প পড়া আমার পাঠকের মন যত চট ক'রে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে, আমরা প্রত্যক্ষদর্শীরা কিন্তু তত তাড়াতাড়ি পারি নি। এমন কি পরিমলবাবু আর মৃণাল দেবীকে সিনেমায় একসঙ্গে দেখেও নয়।

ইণ্টারভ্যালের সময় আমার স্ত্রীই আঙুল দিয়ে দেখালেন, ওই দেখ।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলুম, আমাদের সারির পিছনে, কিছু বেশী দামের আসনে, ওরা দুজনে। পরিমলবাবু আর মৃণাল। কী ভুল দেখুন, পরিমলবাবুর বর্ণনা দিতেই মনে নেই। অবশ্য মূল গল্পের দশম পৃষ্ঠায় এ নিয়ে পুরো একটি প্যারা আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে লোকটি ময়লা, মোটাসোটা, মজবুত ধরনের।

স্ত্রীকে বললুম, যাও, আলাপ ক'রে এস গিয়ে।

ও জোরে জোরে মাথা ঝাঁকুনি দিলে—না, ছি-ছি, লজ্জাও করে না। স্বামী বিদেশে হোটেলে খেয়ে না-খেয়ে ওদের জন্যে খেটে মরেছে, আর উনি সিনেমা দেখতে এসেছেন!

একটু পরে পরিমলবাবুকে দেখতে পেলুম না। সিগারেট খেতে বাইরে গিয়ে থাকবেন। মৃণাল আমার স্ত্রীকে হাতছানি দিয়ে একবার ডাকলে। আমার স্ত্রী যেন দেখেও দেখলে না। আমি ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললুম, ছিছি, না হয় ওরা একটু বেশী দামের সীটেই এসেছে। তাইতে এত চ'টে গেলে?

স্ত্রী আরও চ'টে গেলেন, তাইতে বুঝি? ওদের রকম দেখে পাঁচজনে পাঁচ রকম কথা বলতে শুরু করেছে, জান?

বললুম, অন্তত এক জনেরটা তো জানছি।

রাগ ক'রে আমার স্ত্রী ছবিতে মন দিলেন।

আরো একচোট নিলেন বাড়ি ফেরার পথে।—তোমাকেঁ এতদিন বলি নি। কী বেহায়া জান, লোকটা ওকে একটা শাড়ি দিয়েছে, আমাদের দেখাতে এসেছিল।

শুধু ওকে?

না, ছেলেমেয়েদেরও অবিশ্যি একসেট ক'রে নতুন জামাকাপড় দিয়েছে। ওটা লোক দেখানো। রোজ ডিম আসছে, ফল আসছে, মাংস দিয়ে দশ রকমের রান্না হচ্ছে মুখেও রোচে! ওদিকে সেই বেচারা বিদেশের হোটেলে উপোস দিচ্ছে কি-না ঠিক নেই।

বললুম, সাবিত্রী, সকলের পাতিব্রত্যের আদর্শ হয়তো তোমার মত উঁচু নয়।

স্ত্রী বললে, ঘেন্না। ওর সাজগোজের ঘটা আজকাল কত বেড়ে গেছে দেখতে পাও না?

নিরীহ গলায় জবাব দিলুম, কী করে পাব। তোমার ভয়ে ভাল ক'রে তাকাই না তো।

পরদিন সকালে হঠাৎ ও-বাড়ি থেকে সহর্ষ আবৃত্তি শুনতে পেলুম,··· কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা! তোমার পরশ অমৃতসরস, নয়নে তোমার দিব্য বিভা—

স্ত্রী বললে, শুনলে?

ব্যাপার কী?

ঘুম ভাঙিয়ে মৃণালদি চা খাওয়াতে গেছে যে। তাই কবিত্বের বান ছুটছে।

হেসে বললুম, এ কবিতাটাও কিন্তু ওর রচনা নয়।

না হোক। পরের বউকে পরের লেখা কবিতাই বা শোনাতে যাবে কেন শুনি?

বললুম, ঠিক। এইতো তোমার ঠোঁটের তিলটি দেখে কতদিন বলেছি—ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা. সেও অন্যের রচনা, কিন্তু পরের লেখা নিজের বউকে শোনাতে বোধ হয় দোষ নেই না?

স্ত্রী রসিকতাটায় কর্ণপাতও করলেন না। নিজের ঝোঁকেই ব'লে গেলেন, মরি মরি রুচি! অমন দেবতুল্য সুন্দর যার স্বামী, সে কিনা কদাকার একটা লোকের সঙ্গে—ছিঃ!

অর্থাৎ লোকটা কন্দর্পকান্তি হ'লে তোমার আপত্তি হ'ত না ?

ভারি তার্কিক হয়েছ ! আসল কথা, সব কিছুরই বয়স আছে। বড় বড় ছেলে, দুর্দিন বাদে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তার কি এসব সাজে !

এসব যে খুব উঁচু দরের নীতিকথা নয়, শ্রীমতিকে সেটা বলতে ভরসা হ'ল না।

মূল গল্পে সম্পাদক মশায়, এই পর্যন্ত পৌঁছতে আমার বিশ লেগেছে। অতঃপর আমার সঙ্গে পরিমলবাবুর পরিচয়ও হয়েছিল, তখনকার আলাপ-আলোচনা, এখনকার ক্রমোচ্চ কানাকানি, আরো সব ছোট-খাটো খুঁটিনাটি চিঠিতে বাহুল্যবোধে বর্জন করলুম।

এখানে কেউ কেউ, মহিলারাই বেশী বলতে শুরু করেছিলেন, লোকটার মা আর স্ত্রীর এখানে আসবার কথা ছিল, তাদের কী হ'ল ? পুরুষেরা ভাবছিলেন, লোকটার ছুটি আর ফুরোয় না নাকি ! কলেজের এমন কি হাইকোর্টের ছুটিরও তো শেষ আছে।

শেষ পর্যন্ত একদিন শোনা গেল ওদের যাবার দিন ঠিক হয়ে গেছে। আগামী কাল ওরা সবাই গিয়ে সুধীরবাবু সঙ্গে দেখা ক'রে আসবে। ফিরে এসে কলকাতা।

ওরা যেদিন গেল, তার পরদিনই যদি সুধীরবাবু এখানে হঠাৎ চ'লে না আসতেন তবে হয়তো ব্যাপারটা এমন হাটে-হাঁড়ি হয়ে যেত না। অফিসে কি কাজ পড়েছিল, সুধীরবাবু একদিনের জন্যে এখানে এসেছিলেন। আমরা পরে অনুমান করেছিলাম, ওটা ছুতো। ওঁর কানেও কিছু কানাঘুষো পৌঁছে থাকবে। এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা কই ? শুনলেন, সে কি, ওরা যে আপনার ওখানে।

কবে গেল ?

কেন, কাল।

সুধীরবাবু ওখানেই, মাটির উপরে বসে পড়লেন। কেউ কেউ বললে, সে কি মশায়, আপনার অনেক দিনের বন্ধু।

কে বললে বন্ধু। উনি এখন যেখানে থাকেন, লোকটার সঙ্গে আলাপ সেখানেই। দু দিনেই অবশ্য খাতির জমেছিল। এখানে বেড়াতে আসবে

শুনে সুধীরবাবু নিজেই ওকে ওঁর বাসার ঠিকানা দিয়েছিলেন। ওর মারফৎ স্ত্রীকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন, লোকটার আপ্যায়নের যেন ত্রুটি না হয়।

সুধীরবাবু পরের গাড়িতে ফিরে গেলেন। সৌম্য প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে সেদিন অত্যন্ত করুণ দেখাচ্ছিল।

মৃণালরা কিন্তু ফিরে এসেছিল। ঠিক সাত দিন পরে। মেয়েরা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, একেবারে ভালমানুষের মত গলায়, সুধীরবাবু কেমন আছেন, মৃণালদি ?

ভাল না ভাই। খুব রোগা হয়ে গেছেন। ছুটি নেই নইলে নিজেই আসতেন।

কেউ চোখ টিপল, ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল কেউ।—এ কদিন ওখানেই ছিলেন বুঝি ?

মৃণালদি নাকি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিলেন। ফস ক'রে কে তখন জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, তবে যে শুনলুম আপনারা নৈনিতালে গিয়েছিলেন। এখানকার নিতাইও ঘুরে এল কিনা, সে বললে আপনাদের ওখানে দেখেছে।

এটা আন্দাজী ঢিল, কিন্তু লেগেছে ঠিক। আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি, মৃণালের মুখ পলকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। কোন রকমে নিজেকে সামলে বলেছিল, আমি এখন একবার গা ধুতে যাব ভাই, সারারাত ট্রেনে এসে মাথা ঘুরছে।

বেশী লোক জানাজানির ভয়ে লোকটাকে আর মারধোর করলুম না। পাড়ার মুরুব্বীরা ওকে অড়ালে ডেকে ধমকালেন। সেদিন দুপুরেই পরিমল চম্পট দিলে। সুধীরবাবুকে তার ক'রে দেওয়া হ'ল, পর দিনই ভোরে এসে যেন ওদের এখান থেকে নিয়ে যান।

সন্ধ্যার দিকে ও-বাড়ি থেকে মৃদু কান্নার আভাস পেলুম।

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আবার কী হ'ল।

তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, থিয়েটার। মৃণালদি খালি কাঁদছে আর মূর্ছা যাচ্ছে।

শুনলুম, পরিমলের শোকে নয়, গয়নার। লোকটা নাকি যাবার আগে বাক্স ভেঙ্গে সব নিয়ে গেছে।

কপট সহানুভূতির সুরে বললুম, আহা, তবে তো শোক হতেই পারে। গয়নার চেয়ে মেয়েদের কাছে বড় কী আছে! গহনাৎ পরতরং নহি।

নয়নে অগ্নিবাণ হেনে স্ত্রী বললেন, চুপ কর। মেয়েদের তো সব কিছু জেনে ব'সে আছ! ওর গয়না চুরি গেছে না ছাই! নিজে থেকে সব একখানা একখানা ক'রে তুলে দিয়েছে, নইলে এত সিনেমা আর হিল ইষ্টিসনের খরচ এল কোথা থেকে! আর-সব গয়না যাই হোক, অন্তত একটা যে চুরি যায় নি আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। বলতে বলতে স্ত্রী চাপা গলায় বললেন, জান, মৃণালদির হাতের আংটিটা নেই?

সভয়ে বললুম, ওরে বাবা, এত দূর?

নৈনিতালে সাত দিন কাটিয়ে এল, আরও কতদূর গড়িয়েছে কে জানে?

বোকার মত বললুম, এখন কাঁদে কেন?

এটুকুও বোঝ না, কি বুদ্ধিতে তবে গল্প লেখ! কাঁদে ভয়ে। একজন তো পালিয়েছে, আর একজনের কাছে মুখ দেখাতে হবে না? বাকি জীবনটা যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে, তাকে বোঝাবে কি দিয়ে? তাই নিজে সাধু সেজে লোকটাকে চোর অপবাদ দিচ্ছে।

আমার আসল গল্প, সম্পাদক মশাই, এইটুকু। যে লেখাটা পাঠিয়েছি তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন, ঘটনা প্রায় সবটাই মেলে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝবেন, গরমিলও অনেকখানি। সে তফাত সুরের। আমরা, একালের কথাকারেরা, শুধু গল্প ব'লে তো খুশি নই, সবজান্তাও হতে চাই। মনোবিকলনের দিকে ঝুঁকে পড়ি। আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত চরিত্রের উপর আরোপ করি। মন দিয়ে পড়ুন, দেখবেন, এ ভুল আমি এ গল্পেও করেছি। মৃণালের সঙ্গে পরিমলের ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল, শুধু এটুকু লিখেই ক্ষান্ত হই নি, সেই সঙ্গে বলতে গেছি, কেন। মৃণাল, অমন সুরূপ শান্ত সৌম্য যার স্বামী, পরিমলের মধ্যে কী দেখে ভুলেছিল। উত্তরের খোঁজে তাকিয়েছি পরিমলের কমবয়সী মজবুত শরীরটার দিকে, সবচেয়ে সোজা এবং স্থূল যে সমাধান মনে এসেছে, সেটাই বিনা বিচারে লিখে দিয়েছি। বলতে চেয়েছি, পুরুষের প্রতি অন্ধ আদিম আকর্ষণ ছাড়া মৃণালের ক্ষণিক বিভ্রমের আর কোন হেতু নেই।

গোটা গল্পটাই ওখানে মিথ্যা হয়ে গেছে।

সেদিন কাছাকাছি একটা শহরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ পরিমলের মুখোমুখি প'ড়ে গেলুম। দেখামাত্র চিনলুম, সেও আমাকে চিনল, আর আশ্চর্য, সে পালাতে চেষ্টাও করলে না! বললুম, ভয় নেই, আমি পুলিসে খবর দেব না। সে বললে, জানি। এবং আমাকে অবাক ক'রে বললে, চা খাবেন? বিনা বাক্যে ওকে অনুসরণ করলুম।

ছোট দোকান, কোন মতে এক ধারে দুজনের মত জায়গা পাওয়া গেল।

ভূমিকা না বাড়িয়ে প্রথমেই বললুম, পরিমলবাবু, আমার গোটা কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল।

দেবতা যেমন বর দেন সেই সুরে সে বললে, করুন।

বললুম, আমি একটা ব্যাপার ভাল বুঝতে পারি নি।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে পরিমল বললে, দু দিনের ব্যাপার, ও-সব যেতে দিন।

গম্ভীর গলায় বললুম, দু দিনের ব্যাপার জানি। কিন্তু সেটাই বা কেন ঘটেছিল তাই বুঝতে পারি নি। মৃণালের তো কিছুর অভাব ছিল না।

পরিমল লঘু গলায় হেসে উঠল।—অর্থাৎ আদর্শ উদার স্বামী ইত্যাদি ছিল বলবেন তো? তার পাশে আমি নিছক একটা পশু, না?

বললুম, শুধু উদার নন, সুধীরবাবু ওকে ভালও বাসতেন।

ওখানেই আপনার একটু ভুল হ'ল। পনেরো-কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনের পর কতটুকু প্রেম বাঁচে বলুন তো? কজন স্বামীর চোখে প্রথম দিনের সেই মোহ থাকে?

বাধা দিয়ে বললুম, তবে তো আমি যা ভেবেছি তাই। এ নিতান্ত জৈব ব্যাপার। আপনি বয়সে তরুণ ব'লেই জিতেছিলেন।

পরিমল আবার হাসল।—ফের ভুল হ'ল। জিতেছিলুম আমি নিজে তরুণ ব'লে নয়, ওকে তরুণী ভেবেছিলুম ব'লে।

শূন্য চোখে চেয়ে বললুম, বুঝতে পারলুম না।

পারলেন না? পরিমল গলা নামিয়ে বললে, মৃণালের বয়স কত জানেন? জানলে পারতেন।

বললুম, কত আর? ত্রিশ? পঁয়ত্রিশ?

চল্লিশের একদিন কম নয়। প্রৌঢ়া কোন রমণীকে গদগদ গলায় কবিতা প'ড়ে শুনিয়েছেন কোনদিন? বলেছেন, তার চোখের অতল

কালোয় আপনার মৃত্যু ? ব'লে দেখবেন। তার মুখ-চোখের রঙ-বদল হয় কি না লক্ষ্য করবেন।

বলতে বলতে পরিমল উঠে দাঁড়াল। চেয়ে দেখলুম, ওর হাতে জলজ্বল করছে সেই আংটি।

সেই থেকে আমিও কেবল এই ভাবছি। অন্তত একজনের চোখে এখনও সে তরুণী, এইটুকু যাচাই করতে গিয়েই কি তবে মৃণাল মরল ? কী জানি।

তাই ঠিক করেছি, সম্পাদক মশাই, গল্পটা ফিরেই লিখব। যদি সময় থাকে, তবে লেখাটা পত্রপাঠ ফেরত পাঠিয়ে দিন।

শেষ